দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

আচার্য চাণক্য
কুটিল নীতির নয়
রাষ্ট্র নির্মাণের স্রষ্টা
— পৃঃ ৪

সত্তর বছরে পা দিলেন মোদী,
কিন্তু তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও
আত্মবিশ্বাস অটুট — পৃঃ ১৯

৭৩ বর্ষ, ৬ সংখ্যা।। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২০।। ৪ আশ্বিন - ১৪২৭। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি চীন

১৯৬২-র ভারত আর ২০২০ সালের ভারত এক নয়।
ভারত এখন অনেক বেশি শক্তিশালী ও সুরক্ষিত। এই নতুন
ভারতকে বুঝতে পারেনি চীন। তাই চীনের সামনে মহাসংকট।

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা, ৪ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২১ সেপ্টেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৩

আচার্য চাণক্য : কুটিল নীতির নয়, রাষ্ট্র নির্মাণের স্রষ্টা
▯ কাশ্যপ সেনগুপ্ত ▯ ৪

ভারত-চীন সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনা : এক নতুন বাস্তবতার মুখে চীন ▯ বিমল শঙ্কর নন্দ ▯ ৭

এই মুহূর্তে পাহাড়ের সমরে অ্যাডভান্টেজ ভারত
▯ স্বপন দাস ▯ ১১

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে ▯ ১৩

মোদী সরকার সেনার আধুনিকীকরণে দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে
▯ ডা: আর এস দাস ▯ ১৫

সত্তর বছরে পা দিলেন মোদী, কিন্তু তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস অটুট ▯ নৃপেন্দ্র মিশ্র ▯ ১৯

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম : এই বিভ্রান্তি দূর হওয়া প্রয়োজন
▯ ড. রাকেশ দাশ ▯ ২১

ভারতবর্ষে হালাল সার্টিফিকেশন এক সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা
▯ ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ ▯ ২৪

গো-সম্পদে বলীয়ান হোক পশ্চিমবঙ্গ
▯ নীলাশিস ঘোষদস্তিদার ▯ ২৯

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা
▯ ইন্দুমতী কাটদরে ▯ ৩১

ইন্ডিয়ান-আমেরিকানরা ব্যাটেলগ্রাউন্ড স্টেটের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন ▯ শিতাংশু গুহ ▯ ৩৩

বৈজ্ঞানিক বিভা চৌধুরী ও মহারানি চক্রবর্তী
▯ সুতপা বসাক ভড় ▯ ৩৪

চিঠিপত্র : ২৭

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিকশিত ভারতের রূপকার

বিকশিত ভারতের রূপকার এই অভিধায় ভূষিত হইবার যোগ্য নিঃসন্দেহে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার জন্মদিনে দেশ-বিদেশের রাষ্ট্রনেতাগণ শুভেচ্ছাবার্তায় নানা অভিধায় তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তাঁর শুভেচ্ছাবার্তায় লিখিয়াছেন, 'মোদীর নেতৃত্বে শিখরে ভারত।' তিনি আরও লিখিয়াছেন,' সরকারের প্রধান হিসেবে আপনার কাজ আন্তর্জাতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত। আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে ভারত সাফল্যের সঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক , বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে দ্রুততার সঙ্গে উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের দুই দেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করিবার পিছনে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাহাকে আমি সম্মান করি। আপনার সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাওয়া এবং দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে একসঙ্গে কাজ করিবার জন্য উৎসুক আমি।' একই ভাবে শুভেচ্ছাবার্তা পঠিয়েছেন জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সানা মারিন, নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি প্রমুখ।

বস্তুত, স্বাধীনতার পর এই রকম একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রধানমন্ত্রীকে পাইয়া দেশবাসী গর্বিত। ২০১৪ সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াই নিজেকে জনতার সেবক ঘোষণা করিয়াছেন। দেশ সেবাকেই তিনি জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছেন। বিগত ছয় বৎসরে দেশবাসী ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছে। স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, সামান্য চা-ওয়ালা হইতে শুরু করিয়া তিনি দেশের প্রধান সেবক পর্যন্ত যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। এই যাত্রাপথে তাঁহার সেবার সংকল্প হইয়া উঠিয়াছে নূতন ভারতের মন্ত্র। বড়ো বড়ো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও তাহাকে সঠিক সময়ে রূপায়িত করা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের অংশ হইয়া উঠিয়াছে। নীতি হউক কিংবা প্রকল্প ঘোষণা করিবার পূর্বেই তিনি তাহা বাস্তবায়িত করিবার প্রস্তুতি শুরু করিয়া দেন। গত ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি যত ঘোষণা করিয়াছেন তাহা লালফিতার ফাঁসের শিকার হইতে পারে নাই। সরকারের রীতিনীতিই শুধু নহে, সর্বক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল যথার্থই বলিয়াছেন, 'বড়ো বড়ো চ্যালেঞ্জের কাছে মাথা নত না করিয়া গোটা বিশ্বে সমাদৃত মোদীজী জীবনের পথে যেইভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছেন, তাহা প্রত্যেক মানুষের জন্য আজ প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিয়াছে। পাঁচহাজার বৎসরের ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে দেশকে আগাইয়া লইয়া বিশ্ব দরবারে ভারতবর্ষের শক্তি ও সামর্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণ করা পদক্ষেপ বিশ্বের ৭৫০ কোটি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।' দেশবাসীই তাঁহার পরমাত্মীয়। দেশের একবারে পিছনের সারির শেষ মানুষটির জন্যও তাঁহার ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহর ৭০ তম জন্মদিনে করোনা মহামারীর কথা মনে রাখিয়া দেশবাসীর নিকট উপহার চাহিয়াছেন– 'আপনারা মাস্ক পরিধান করুন, সামাজিক দূরত্ব মানিয়া চলুন, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন, পৃথিবীকে আরও স্বাস্থ্যকর করিয়ায়া তুলুন।' এমনটি করিয়া আর কোন প্রধানমন্ত্রী ভাবিয়াছেন! সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর বিকাশযাত্রাকে অব্যাহত রাখিতে ১৩৫ কোটি ভারতবাসীকেও তাঁহারই মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। কেননা এই যাত্রা ভারতকে বিশ্বগুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার যাত্রা।

সুভাষিতম্

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্।।

বর্ষাঋতুর আগমনে কোকিল তার ডাক বন্ধ করে দেয়। কারণ যেখানে ব্যাং ডাকে সেখানে মৌন থাকাই শ্রেয়।

আচার্য চাণক্য

কুটিল নীতির নয়, রাষ্ট্র নির্মাণের স্রষ্টা

কাশ্যপ সেনগুপ্ত

সাম্প্রতিককালে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে 'চাণক্য' নামটা খুবই ট্রেন্ড হচ্ছে। সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত, ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপে যে পারছেন সেই বিশেষজ্ঞের মতো চাণক্য 'এই বলেছেন, ওই বলেছেন' বলে অনেক ভারী ভারী জ্ঞানের কথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। যদিও তাদের মধ্যে কতজন যে 'বিশেষজ্ঞ' এবং চাণক্য সম্পর্কে কতটা কী জানেন, সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইউটিউবে তো হাজারো ভিডিয়োর ছড়াছড়ি। যার মধ্যে প্রকৃত বিশেষজ্ঞের তথ্য ও বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ ভিডিয়োর সংখ্যা খুবই কম। আর সবার ওপর দিয়ে এক কদম এগিয়ে গেছেন গুটি কয়েক সংবাদপত্রের জনাকয়েক সর্বজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁরা ভারতের প্রায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলেরই এক বা দু'জন করে ব্যক্তিকে সেই দলের অথবা সেই দল যে পন্থার (দক্ষিণ/মধ্য/বাম) রাজনীতি করে, তার 'চাণক্য' বলে দেগে দিচ্ছেন। তা এতোই যখন চাণক্যের ছড়াছড়ি বর্তমান ভারতে তাহলে আমাদের এই দেশটার এতো দুর্দশা হয় কী করে? ইতিহাস বলে, পৃথিবীতে চাণক্য একজনই ছিলেন, সেই মহামতির জন্মভূমি থেকে কর্মভূমি সবই ছিল এই ভারতবর্ষ। তবে আজকের ভারতবর্ষ নয়, প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশ। যেখানে আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ সবই ছিল এক অখণ্ড বিশাল ভারত ভূখণ্ডের অঙ্গ।

সোশ্যাল মিডিয়াতে অঢেল সময় ব্যয় করে যাঁরা চাণক্যের নামে বড়ো বড়ো বুলি কপচাচ্ছেন, তাঁদের কিছু বলার নেই। বাক্য ও মতামত প্রকাশের অধিকার সকলের আছে, ফলত যা খুশি বলার ওপরে একটা অধিকার জন্মে গেছে। এর জন্য কোনও কর লাগে না। এদের মধ্যে আবার ছোটো-বড়ো একাধিক রাজনৈতিক

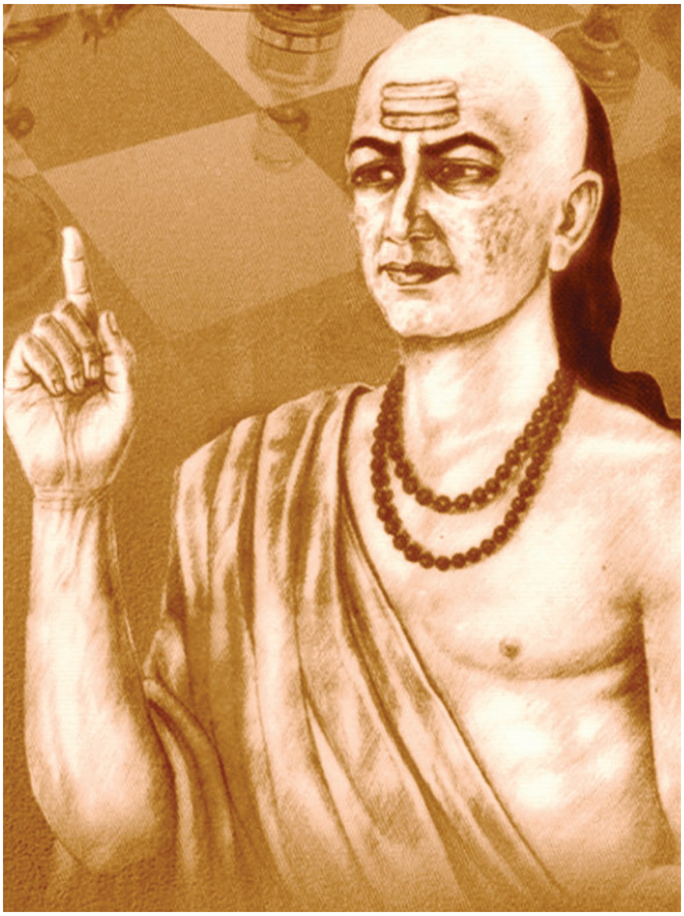

চাণক্য নীতি ১৩০০ বছর পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক, তার প্রমাণ বর্তমান সরকারের চাণক্য রচিত বিজিগীষু রাজার দ্বাদশ রাজমণ্ডলের doctrine-কে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। যারা চাণক্যের দর্শন জানেন, তারাই বুঝতে পারবেন দ্বাদশ রাজমণ্ডলের সাফল্য আজকের দিনে কত প্রাসঙ্গিক।

দলের বিভিন্ন মাপের নেতারাও আছেন। তাঁরা আজকের চাণক্য হওয়ার দৌড়ে নেমে পড়েছেন। 'সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ'— এই চতুর্বিধ নীতিকে ব্যবহার করেন জনতার চোখে ধুলো দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোর কাজে। বিরোধীদের

কুপোকাত করার কাজে। সে বিষয়ে তারা সিদ্ধহস্ত। কিন্তু মানুষের প্রতি তাদের দায়িত্ব বা দায়বদ্ধ থাকার প্রশ্নে অথবা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, অখণ্ডতা ও সীমানাকে সর্বাগ্রে কেমন করে সুরক্ষিত রাখতে হবে, সেই বিষয়টা তাদের কাছে অনেক পেছনের সারিতে। রাষ্ট্র না থাকলে যে সাধারণ মানুষ থেকে দলের নেতা, কারোরই কোনও স্বার্থ পূরণ হবে না, সেটা ক'জন মাথায় রাখেন? কিন্তু খ্রিস্টের জন্মের ৩৭০ বছর আগে রাষ্ট্রতত্ত্বের যে স্রষ্টা এই ভারতে জন্মেছিলেন, তিনি এই চতুর্বিধ নীতিকে সম্পূর্ণ ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন জনকল্যাণ, জনতার সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নতি, রাষ্ট্রের কৃষি-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রশাসন ও রাজনীতির শুদ্ধিকরণ এবং অখণ্ড ভারতরাষ্ট্রের নির্মাণ ও তার সুরক্ষার কাজে। যেখানে শাসক রাজা সর্বোচ্চ কর্তব্যের অধিকারী হলেও শেষ পর্যন্ত প্রজার প্রকৃত সেবক হতে বাধ্য। আজকের ভোট প্রার্থী নয়। নাগরিকের কাছে চূড়ান্ত ভাবে দায়বদ্ধ। আজকের দিনে তা দলীয় স্বার্থ ও দলের সুপ্রিমোর কাছে। শাসকের কোনও ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই, নিহিত ক্ষেত্রে স্বার্থ বলে কিছু থাকতে পারে না। রাজধর্মের অনুশাসন তাঁকে পালন করতেই হবে, কারণ জনগণের হিত ও সুখেই শাসকের হিত ও সুখ। শাসক যদি সেই রাজধর্ম পালনে ব্যর্থ হন, নিজের আখের গোছাতে থাকেন, তাহলে তাঁর কোনও অধিকার নেই সিংহাসনে বসে থাকার। আজকের দিনে ভারতীয় রাজনীতির কারবারিদের ক্ষেত্রে তা কার্যত 'ডুমুরের ফুল'।

একদা পশ্চিমবঙ্গে অনিল বিশ্বাসকে বলা হতো সিপিআইএমের চাণক্য। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পামুলাপার্তি বেঙ্কট নরসিমহা রাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁকেও সম্বোধন করতে শুনেছিলাম চাণক্য হিসেবে। শেষে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তাঁকেও বলা হলো চাণক্য। কিন্তু নিখাদ সত্য হলো— এঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের কর্মকর্তব্যের সর্বোচ্চ স্থানে গেছেন, নিজেদের চূড়ান্ত যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাকে প্রমাণ করেছেন। অনেকেই চাণক্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন কিন্তু এঁরা কেউই চাণক্য নন। যাঁরা এঁদেরকে চাণক্য হিসেবে সম্বোধন করেছেন বা চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করছেন, তাঁরা কার্যত চাণক্যকে যেমন অপমান করছেন, তেমনি একই সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠিত মানুষদেরকেও অপমান করছেন। কারণ এঁদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও দলীয় রাজনীতির অভ্যন্তরীণ যে বিস্তৃত পার্থক্য আছে, তাকে উপেক্ষা করে যাওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। যদিও তাঁরা জানতেন উভয়ের 'অন্তর'কে। কিন্তু মহামতি চাণক্য এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ ২৩৬০ বছর আগে চাণক্য রাজনৈতিক ও রাজনীতির প্রভেদ কী এবং কখন উভয়ে একে-অপরের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে বা পড়তে পারে, সেই ধারণার অভিজ্ঞতালব্ধ তাত্ত্বিক জ্ঞানকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন অখণ্ড ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে। সুতরাং তাঁর সঙ্গে এঁদের তুলনা যারা করেন, তাদের পাণ্ডিত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত।

ভারতের নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শনের যোগ্য কাণ্ডারি শুধু নয়, মহামতি চাণক্য হলেন 'Philosopher of the state craft'। তিনি তাঁর অর্থশাস্ত্রের রাষ্ট্রের জনসমাজ সম্পর্কিত হেন বিষয় নেই, যাকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। R.A. Kangle তাঁর The Kautilya Arthasastra গ্রন্থে লিখেছেন, 'Arthasastra is the science which is the means of the acquisition and protection of the earth'। পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশীলার ছাত্র তথা সেখানকারই আচার্য রূপে চাণক্য বিশ্বের তৎকালীন সভ্যতাগুলোর সামনে উপস্থিত করেছিলেন অপার শক্তিশালী মৌর্য সাম্রাজ্যকে, চন্দ্রগুপ্তের মতো শাসককে তৈরি করেছিলেন সমাজের প্রান্তিক স্তর থেকে। ভারত কয়েক সহস্রাব্দ ধরে বহিঃশত্রুর আক্রমণের শিকার। শত্রুর আক্রমণের সামনে সুদৃঢ় ভাবে টিকে থাকতে গেলে অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলোর দ্বিধাদ্বন্দ্বকে ত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠন করা ছাড়া আর কোনও উপায় যে নেই, তা তিনি দেখিয়েছেন প্রথম। রাজনীতির শুদ্ধিকরণের জন্য নিজের সমগ্র জীবন দান করেছেন। তাঁর রাজনীতি ধর্মের প্রধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, যে 'ধর্ম' পশ্চিমের সম্প্রদায় ভিত্তিক রিলিজিয়ন নয়, সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয়। যেখানে ন্যায়, নীতি, কর্তব্য, উত্তর-দায়িত্ব হলো মুখ্য। রিলিজিয়নের ভারতীয় সমার্থক শব্দ রূপে 'ধর্ম'কে ইংরেজেরা চিহ্নিত করেছেন। চাণক্যই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহিত্যে প্রথম একটি কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী সরকারের পরিচয় প্রকাশ করেন। অর্থশাস্ত্রেই প্রথম রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও প্রকৃতি সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। তিনিই প্রথম রাষ্ট্রের ও বৃহত্তর সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজা (শাসকের অপরিহার্য গুণাগুণ ও যোগ্যতা, সর্বোচ্চ ভূমিকা), মন্ত্রী ও আমলাতন্ত্রের, জনপদের গুরুত্ব, রাজকোষ, বিচারব্যবস্থা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের নিজস্ব অতি দক্ষ-শিক্ষিত গুপ্তচর বাহিনী থাকা কেন প্রয়োজন, তা কবেই নথিভুক্ত করেছেন। আইনের অনুশাসন, জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিরিখে শাসনব্যবস্থার মানকে বিচার করার সূত্র দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা জানিয়েছে, ম্যাকিয়াভেলি (১৫১৬) হলেন আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক। চাণক্য হলেন ভারতের ম্যাকিয়াভেলি। কিন্তু দুজনের মধ্যে প্রায় ১৯০০ বছরের তফাত। ভারতীয় বহু গ্রন্থের প্রতিলিপি বিদেশিদের মাধ্যমে আরব দুনিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়েছে। আবার আক্রমণকারীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অজস্র পাণ্ডুলিপি অনেক কিছু জ্বালিয়েছে। অতীতের প্রভাব ভবিষ্যতের ওপরে পড়তে পারে, কিন্তু অতীতকে ভবিষ্যতের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। চাণক্য কখনোই ম্যাকিয়াভেলি হতে পারেন না, কারণ চাণক্য অ্যারিস্টটলের সমসাময়িক। জনপ্রশাসনের ক্ষেত্রেও জেনেছি উড্রো উইলসন হলেন জনক। কিন্তু ২৩০০ বছর আগে ভারতে যে বিশাল জনপ্রশাসন ব্যবস্থা বিস্তার করেছিল তাতে চাণক্যের কী ভূমিকা ছিল তার প্রমাণ প্রমথনাথ ব্যানার্জির Public Administation in Ancient India, K.K. Mishra-র Police Administation in Ancient India-সহ আরও অজস্র গ্রন্থ। রাষ্ট্রের যে স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতি ও তাকে পরিচালনা করার জন্য দক্ষ কূটনীতির প্রয়োজন, তা প্রথম চাণক্য রচনা করেন, যখন আজকের ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অস্তিত্বই ছিল না।

সংসদীয় ব্যবস্থায় দুজন শাসক সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক প্রধান

হলেন – রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। বাস্তবে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনেই কাজ করেন। প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাষ্ট্রপতির সর্বোচ্চ পদে তাঁর দল কংগ্রেস বসিয়েছিল, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে। যদিও প্রণব মুখোপাধ্যায় নিজে কয়েকবার (প্রধানত ২০০৪-২০১৪) প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে থেকে সিংহাসনে বসতে গিয়েও শেষ অব্দি বসতে পারেননি। কেন, সবাই জানেন, রাহুল গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বের পথে যেন কোনও বাধা না আসে। অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ সামন্তের বাংলা কংগ্রেস থেকে যাত্রা শুরু করে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের হাত ধরে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কংগ্রেসের রাজনীতিতে আসা। পরবর্তী সময়ে নিজের জ্ঞান, তুখোড় উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা, বাগ্মিতা, রাজনীতির অনুশীলন ও ধৈর্যের সাহায্যে ১৯৮০-র দশকে ইন্দিরা গান্ধীর অন্যতম পরামর্শদাতা ও অর্থদপ্তর-সহ পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রের মতো একাধিক দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে ভারতের উন্নয়ন ও রাষ্ট্রনির্মাণের কাজে অবদান রেখেছেন। কিন্তু দলীয় হাইকমান্ডের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার জেরে কংগ্রেস ছেড়ে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল রাজীব গান্ধীর অমলে। আবার বাস্তববাদী ছিলেন বলেই, সমস্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। দলীয় ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিজের প্রভাব ফেললেও রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে পর্যন্ত, নিজের দর্শন ও পার্টি লাইনের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। এমনকী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সভাতে যাবেন কেন বা গিয়ে কী বলবেন, সে নিয়েও তাঁর দল থেকেই অনেক আতঙ্কমাখা শ্লেষ উঠতে দেখা যায়।

নরসিমহা রাও ভারতের একমাত্র সংখ্যালঘু সরকারের মুখিয়া ছিলেন, যে সরকার পুরো পাঁচ বছর শুধু ক্ষমতায় ছিল তাই নয়, পণ্ডিত নেহরুর আমল থেকে চলে আসা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামোকেই মূল সমেত উৎপাটিত করে। দু'হাত বাড়িয়ে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্বায়নের ত্রিশক্তিকে ভারতে স্বাগত জানায়, দেউলিয়া হতে চলা ভারতীয় অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য। নতুন ভারতের নতুন অর্থনীতির জনক তিনি। কারণ প্রধানমন্ত্রী যদি বাস্তব প্রয়োজনকে চিনতে না পারেন, তাহলে কোনও মন্ত্রী একক ভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি গ্রহণ করতে পারেন না। শেষ কথা প্রকৃত শাসকই বলবেন। গোপনীয়তাকে ত্যাগ করে প্রকাশ্যে ইজরায়েলে প্রথম ভারতীয় দূতাবাস গড়ে তোলেন, প্রথম পূর্ব-এশিয়ার দিকে সামগ্রিক ভাবে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এগিয়ে যান। সমাজতন্ত্রের পতনকে আঁচ করে আমেরিকার সঙ্গে ইতিবাচক সম্পর্ক গঠনে উদ্যোগী হন। এসবের পরেও তিনি সম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্ধ হয়েছেন, হর্ষদ মেহেতা কেসে তাঁর নাম জড়িয়েছে। সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসের ব্যাটন হাতে নেওয়ার পর তাঁর গতি কী হলো, সে সবাই দেখেছেন। আসলে তিনিও দলীয় সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে আসতে পুরোপুরি পারেননি, চেষ্টা করার ফল হাতেনাতে পেয়েছিলেন।

অনিল বিশ্বাস তো কখনো চাণক্য হতেই পারেন না। তিনি যে আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সেখানে রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। রাষ্ট্রকে শ্রেণী শোষণের যন্ত্র রূপে দেখা হয়। রাষ্ট্রের ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েম হবে আশা করা হয়। আমলাতন্ত্রকে মার্কস প্যারাসাইটিক নেচার অব জার্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিপ্লব বা বন্দুকের নল দিয়ে লেনিন বা মাও যে সমাজতন্ত্র কায়েম করেছিলেন তা মহামতি চাণক্যের শাসনতন্ত্র ও জনকল্যাণের সম্পূর্ণ বিপরীত। কমিউনিজমের কাছে সবার ওপরে দল কিন্তু কৌটিল্যের কাছে রাষ্ট্রের সামগ্রিকতা। সমাজের সর্বস্তরে (বিশেষত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে) দলীয় নিয়ন্ত্রণ ও আনুগত্য কায়েম করার ক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধহস্ত হলেও তাঁর সেই কুটিল কৌশল কৌটিল্য শব্দের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

স্বাধীনতার পর পণ্ডিত নেহরু ভারতের বিদেশনীতি, অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতি নির্মাণে মার্কসীয় নির্ভরতা তত্ত্বের উদগাতা অন্দরে গুন্ডাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল নাস্তি। বিচ্ছন্নতা ছিল মৌলিক উপাদান। ফলত, উপস্থিত বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে অলীক ভাবাদর্শবাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফল কী হয়, জোটনিরপেক্ষতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক নেহরু চীন আক্রমণের সময়ে নির্বান্ধব থেকে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরিরা বাস্তববাদী হতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী থেকে গেছেন। না হলে, ১৯৯৮-এর ১১ মে পোখরানে পরমাণু শক্তির পরীক্ষা হয় ১৯৭৪-এর পর? নরসিমহা রাও থেকে প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই এই পথের পথিক। বিগত সাত দশকেও ভারতের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা নীতি তৈরি হলো না? ভারত স্বাধীনতার পর আচার্য চাণক্যকে অনুসরণ করেনি, কারণ নীতি নির্মাতাদের মাথায় ছিল সেই মেকলেবাদী কৌশলী শিক্ষা— 'ভারতের নিজস্ব সৃষ্টি বলে কিছু ছিল না, সবই সাহেবদের দান'। অন্যদিকে, মাও-য়ের নেতৃত্বে চীন তার দেশের কৌটিল্য অর্থাৎ 'হান ফেইজী (২৮০-২৩৩ খ্রি.পূ.)-র রাজনৈতিক দর্শন প্রথম দিন থেকে অনুসরণ করছে। চাণক্যের দর্শন সর্বাগ্রে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার কথা বলে, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপরে প্রশ্ন তুলে দেয়। চাণক্য নীতি ১৩০০ বছর পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক, তার প্রমাণ বর্তমান সরকারের চাণক্য রচিত বিজিগীষু রাজার দ্বাদশ রাজমণ্ডলের doctrine-কে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। যারা চাণক্যের দর্শন জানেন, তারাই বুঝতে পারবেন দ্বাদশ রাজমণ্ডলের সাফল্য আজকের দিনে কত প্রাসঙ্গিক।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভারত-চীন সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনা

এক নতুন বাস্তবতার মুখে চীন

বিমল শঙ্কর নন্দ

১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর। চীনের গণমুক্তি ফৌজ লাদাখের ম্যাকমোহন লাইন জুড়ে এবং কয়েকদিন পর নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি অর্থাৎ বর্তমান অরুণাচল প্রদেশের উপর হামলা চালায়। শুরু হয় ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ। ভয়ংকর আগ্রাসী চীনা বাহিনীর সঙ্গে ভারতের বীর জওয়ানরা লড়াই চালিয়ে যায় নভেম্বর মাসের ২১ পর্যন্ত। ২১ নভেম্বর চীন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। কারণ ৩৩ দিন চীন তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করে ফেলেছে। ৩৩ দিনে প্রায় ৩৮০০০ বর্গকিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ড চীনের গ্রাসে চলে গেছে ওয়েস্টার্ন সেক্টরে। ইস্টার্ন সেক্টরে চীনা বাহিনী নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি বা নেফা এলাকা শুধু দখলে নেয়নি, অসমের তেজপুর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে চীনাবাহিনী। চীনা বাহিনী পরে অসম এবং নেফা ছেড়ে ফিরে গেলেও লাদাখের ৩৮০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকার উপর দখলদারি কায়েম রাখে। ১৯৬৩ সালের চীন পাকিস্তান বিতর্কিত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার এলাকা চীনকে দিয়ে দেয় পাকিস্তান। অর্থাৎ ভারতের ৪৩০০০ বর্গকিলোমিটারের বেশি এলাকা সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে চীনের দখলে চলে যায়।

২০২০ সালের মে মাস। মে মাসের পাঁচ তারিখ থেকেই ভারত চীন সীমান্তের ওয়েস্টার্ন সেক্টরে ভারত ও চীনের সৈন্যদের মধ্যে আবার উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। মূলত গালওয়ান ভ্যালি, প্যাংগং লেক এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে চীনের সেনাবাহিনী প্ররোচনামূলক কাজকর্ম শুরু করলে ভারতের সেনারা বাধা দেয়। কিছুটা উত্তেজনা দেখা দেয় সিকিম-তিব্বত সীমান্ত অঞ্চলেও। প্রাথমিক পর্যায়ে দুটি দেশের সেনাদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটলেও জুনের ১৫-১৬ তারিখে গালওয়ান উপত্যকার কঠিন পাহাড়ি অঞ্চলে দুটি দেশের সৈনিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে যায়। ভারতের ২০ জন বীরযোদ্ধা দেশের ভূখণ্ড রক্ষায় জীবন বিসর্জন দেন। ভারতীয় সেনাদের পালটা মারে প্রচুর চীনাসেনা হতাহত হয়। চীনের তরফে তাদের সৈনিকদের নিহত এবং আহত হওয়ার কোনো খবর স্বীকার কিংবা অস্বীকার কিছুই করা হয়নি। এটা অবশ্য চীনের স্বৈরতান্ত্রিক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত খবর রাখে এমন বিভিন্ন সংস্থা এবং সংগঠনের খবর অনুযায়ী চীনের তরফে ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক। চল্লিশ জন কিংবা তারও বেশি চীনাসৈন্য এই সংঘর্ষে হতাহত হয়েছে। চীনের মানুষজন তাদের সরকারের কাছে

দাবি তুলেছে ভারত যেমন স্বচ্ছতার সঙ্গে তার আহত এবং দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া সৈন্যদের নাম প্রকাশ করেছে, চীনের সরকারও সে দেশের মানুষদের প্রকৃত তথ্য জানাক। তবে একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা হওয়ার কারণে চীনে জনমতের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে না বা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে তারা জনমতের স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটতে দেয় না। কারণ তাতে প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধের পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়তে পারে। তাতে গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থাই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে। যাই হোক, ১৬-১৬ জুনের সংঘর্ষে চীনের গণমুক্তি ফৌজের সদস্যরা বেশ ভালোই শিক্ষা পেয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যদিও এই সংঘর্ষে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়নি, তবু সমস্ত রকমের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে চীন কিছু প্রথাগত অস্ত্র নিয়েই হামলা চালিয়েছিল। ভারতীয় সেনাদের তৎপরতায় চীনা সেনাদের আগ্রাসী মনোভাব দমন করা সম্ভব হয়েছে। আজ সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এসে লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা অঞ্চলে ভারতীয় সেনা তার অবস্থান মজবুত করেছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৪৩৫০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত প্যাংগং লেকের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্বতশীর্ষ এখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে। ফলে সামরিক দিক থেকে ভারত এই অঞ্চলে অত্যন্ত সুবিধাজনক স্থানে রয়েছে। আর চীনা সেনাবাহিনী মুখোমুখি দ্বন্দ্বে সুবিধা করতে না পেরে এখন ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের মিথ্যা অভিযোগ আনছে। চীনকে এমন বেকায়দায় পড়তে এর আগে কখনো দেখা যায়নি।

১৯৬২ থেকে ২০২০ সাল। এই ৫৮ বছরে গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বহু লক্ষ কিউসেক জল গড়িয়ে গেছে। ১৯৬২-এর ভারতের সঙ্গে ২০২০-র ভারতের এখন অনেক তফাত। প্রথমে ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ এবং পরে ২০১৪ থেকে আজ ২০২০— এই ১২ বছরের এনডিএ শাসনে ভারতের বিদেশনীতি, ভারতের প্রতিরক্ষা নীতিতে ব্যাপক বদল এসেছে। এক শক্তিশালী, আত্মনির্ভর বিশ্বশক্তি হয়ে ওঠার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপ করে চলেছে এনডিএ শাসনাধীনে থাকা ভারতবর্ষ। চিরাচরিত দুর্বল দেশ এবং দুর্বল নেতৃত্বের তকমা ঝেড়ে ফেলে এক নতুন দেশ ও তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বের দরবারে এক নতুন ধরনের দেশকে উপস্থিত করেছে। এশীয় ও বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতবর্ষ তার যোগ্য ভূমিকা পালন করতে প্রস্তুত। চীন এই ভারতকে চিনতো না। ফলে এক ধরনের অতি উৎসাহী পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছিল তারা। কিন্তু এর ফলে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়েই ব্যাপক সংকটের মুখোমুখী হয়েছে চীন। আগামীদিনে চীনের এই সংকট আরও বাড়তে পারে। ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে চীনের স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা। চীনের শাসক এলিটরা এই সংকটের আশঙ্কাতেই উন্মাদের মতো আচরণ শুরু করেছে। ভারতের কূটনীতি ও প্রতিরক্ষা নীতির জয় এখানেই।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো রাষ্ট্র যদি সঠিক ভূমিক পালন করতে চায় তবে প্রথমেই সেটা প্রয়োজন তা হলো আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং তার গতি প্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করা। বিশ্বের যে অঞ্চলে দেশটি অবস্থান করে তার রাজনৈতিক ও কৌশলগত গুরুত্বটিকে ঠিকমতো বুঝে নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা। এই ভাবনাগুলোর দার্শনিক আলোচনা প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তাতেই পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে 'দ্বাদশ রাষ্ট্রমণ্ডল'-এর ধারনায় একটি রাষ্ট্র কীভাবে তার নীতি ঠিক করবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই আলোচনায় কৌটিল্য রাষ্ট্রের পরিচালককে বলেছেন প্রথমেই নিজের শত্রু এবং মিত্রকে চিনে নিতে। কৌটিল্যের ভাষায় সাধারণ সীমান্ত আছে এমন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে। তারা হয়ে ওঠে পরস্পরের 'অরি'। তাই রাষ্ট্রের প্রয়োজন নিজের 'মিত্র'কে খুঁজে নেওয়া। সাধারণভাবে অরির যে অরি, অর্থাৎ শত্রুর যে শত্রু তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনই বাঞ্ছনীয়। এইভাবে একটি রাষ্ট্রমণ্ডলে কোনো রাষ্ট্র তার নীতি নির্ধারণ করতে পারে এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লেখা অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য রাষ্ট্রের বিদেশ ও প্রতিরক্ষা নীতির যে ভাবনা উপস্থাপিত করেছিলেন এই আধুনিক যুগেও তার গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। বরং বার বার এর গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধুনিক বাস্তববাদী তত্ত্বের প্রধান ব্যাখ্যাকার হিসেবে যাকে চিহ্নিত করা হয় সেই হ্যানস জে. মরগেনথাউ ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত Politics Among Nations গ্রন্থে তাঁর বাস্তববাদী

ভাবনার অন্যতম উৎস হিসেবে কৌটিল্যের উল্লেখ করেন। তার মূল ভাবনা হলো বিশ্ব রাজনীতিতে কোনো রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে গেলে এবং অস্তিত্বকে সঠিকভাবে বজায় রাখতে গেলে তাকে তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতেই হবে। আর এটা করা সম্ভব যদি সে ক্ষমতা অর্জন করতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত জাতীয় স্বার্থই হওয়া উচিত একটি দেশের বিদেশ নীতি এবং প্রতিরক্ষা নীতির মূল ভিত্তি।

মরগেথাউ-এর ভাবনা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু 'ক্ষমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত জাতীয় স্বার্থ'-এর গুরুত্বকে কেউই অস্বীকার করতে পারেননি। স্বাধীনতার ঠিক পরেই জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল ভারতের জাতীয় স্বার্থকে গুরুত্ব না দিয়ে এক কল্পিত বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্নে বুঁদ হয়ে থাকা। তাই ১৯৪৭-৪৮ সালে কাশ্মীরে পাক হানাদারির সময় ভারতীয় সেনারা যখন গোটা কাশ্মীরকে পাক হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত করতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যচ্ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে খুবই সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল, নেহরু তখনই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন। ফলে কাশ্মীরের এক তৃতীয়াংশ এলাকা অধিকৃত কাশ্মীর হিসেবে থেকে যায় পাকিস্তানের হাতে। থেকে যায় দক্ষিণ এশিয়ার এক স্থায়ী সমস্যা। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে আকসাই চীন অঞ্চলের প্রায় ৩৮০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা চলে গেল চীনের দখলে। এরও বড়ো কারণ নেহরুর ভুল প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ নীতি। ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা নীতি নির্ধারকদের প্রথম ভুলই ছিল চীনের মতিগতি বুঝতে ভুল করা। চীনের দীর্ঘমেয়াদী এক আগ্রাসী নীতি আছে, চীন ভারত-চীন সীমান্ত নির্ধারণকারী ম্যাকমোহন লাইনকে কোনোভাবেই স্বীকৃতি দিচ্ছে না, বিশ্বের মুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলোর প্রতি চীনের স্বৈরাচারী শাসকদের জাতক্রোধ, ১৯৫০-এর কোরিয়ার যুদ্ধে চীনের সক্রিয় অংশগ্রহণ— চীনের মনোভাব বুঝতে এই ঘটনাগুলির যথেষ্ট ছিল। নেহরু বোঝেননি। ১৯৫০-এর পর থেকে চীন তিব্বতের উপর দখলদারি বাড়তে থাকে। ভারত রাষ্ট্রে যেসব প্রতিনিধি লাসা-সহ তিব্বতের অন্যান্য অঞ্চলে ছিলেন তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সামান্য প্রতিবাদ ছাড়া নেহরু আর কিছুই করেননি। এর পর চীন আকসাই চীন অঞ্চলে সেনাসমাবেশ বাড়াতে থাকে। কারণ জিনজিয়াং প্রদেশেকে নিয়ন্ত্রণ করতে আকসাই চীন অঞ্চলকে দখলে রাখার প্রয়োজন ছিল। চীনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগাযোগ রক্ষা করতে আকসাই চীন দিয়ে রাস্তা তৈরির ভাবনা ছিল চীনের যাতে সহজে পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে ইরান এবং এর মাধ্যমে আরব দেশগুলির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হয়। আর নেহরু তখনো চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা এবং বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে চলেছেন। চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষায় নেহরু এতো আগ্রহী ছিলেন যে ১৯৫০ সালে জাপানে আয়োজিত একটি সম্মেলনে তিনি গেলেন না, কারণ সেখানে চীনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ১৯৫৪ সালে নেহরু চীনের সঙ্গে স্বাক্ষর করলেন পঞ্চশীল যুক্তি। ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো হিন্দি চীনি ভাই ভাই-এর ধারণা, কিন্তু এর পরও ১৯৬২-তে আটকানো যায়নি। ভারতের ৪৩০০০ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড চীনের আগ্রাসী থাবার মধ্যে রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, চীন তার 'সালামি স্লাইসিং' নীতি অনুসরণ করে একটু একটু করে ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় আগ্রাসন চালিয়েছে। ভারতীয় সেনাদের বাধায় পিছু হঠলেও চীন কখনোই আগ্রাসন বন্ধ করেনি।

২০২০ সালের মে মাস থেকে লাদাখ অঞ্চলে চীনের উস্কানিমূলক কার্যকলাপ চীনের এই নীতিরই অংশ। কিন্তু গত দু' দশকে ভারতের প্রতিরক্ষা ও বিদেশ নীতিতে বদল এসেছে। ১৯৯৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এনডিএ সরকার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক এবং চীনের ভূমিকাকে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। ভারতের নীতি নির্ধারকরা একটি বিষয়ে একমত হন যে 'চীনই ভারতে এক নম্বর শত্রু'। চীন ২০৪৯ সালের মধ্যে বিশ্বে একটি মহাশক্তিতে পরিণত হতে চায়। কারণ সেই বছর চীন বিপ্লবের শতবর্ষ পূর্ণ হবে। আর এশীয় তথা বিশ্ব রাজনীতিতে চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নে চীনের ক্ষমতাশালী এলিটরা মশগুল হয়ে আছেন সেই স্বপ্ন পূরণের পথে বড়ো বাধা হন শক্তিশালী ভারত। তাই বিগত দু' দশকে চীন ভারতকে কূটনৈতিক ভাবে এবং কৌশলগত উপায়ে ঘিরে ফেলার চেষ্টা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

করেছে। ভারতে প্রতি শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের কাজ করেছে। ভারতের বন্ধুদেশগুলোর কিছু শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ভারত বিরোধিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। দরিদ্র দেশগুলিকে সাহায্য করার নামে ঋণের ফাঁদে ফেলে সেইসব দেশের নিজের দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনো চালিয়ে যাচ্ছে।

২০১৪ সাল থেকেই ভারতে প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ নীতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে। এই নতুন নীতির রূপকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদীর বিদেশ নীতির প্রধান লক্ষ্যই হলো বিশ্বব্যবস্থায় ভারতকে এক শক্তিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। একদিকে 'Neighbourhood First' নীতি অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা, অন্যদিকে জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতিবেশী-সহ বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মোদী সরকারের নীতি হলো এক শক্তিশালী আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা যাতে একদিকে অপরের উপর নির্ভরতা কমে, অন্যদিকে দেশে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন ধরে ভারত-তিব্বত সীমান্তে পরিকাঠামো উন্নয়ন অবহেলিত ছিল। মোদী সরকারের উদ্যোগে ওয়েস্টার্ন সেক্টরে লাদাখ অঞ্চল থেকে শুরু করে ইস্টার্ন সেক্টরে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত অঞ্চলে পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি ঘটানো হয়েছে। লাদাখের দৌলত বেগ ওল্ডি অঞ্চল পর্যন্ত অত্যাধুনিক রাস্তা তৈরি করে ফেলেছে ভারত। ফলে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের যোগাযোগের লাইন লাইন কারাকোরাম হাইওয়ে এখন ভারতীয় সেনাদের নজরদারির আওতায়। ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল চুক্তি আর রাশিয়ার সঙ্গে 'ট্রায়াম্ফ ৪০০ মিসাইল ডিফেন্স চুক্তি'-এর মাধ্যমে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন অনেক মজবুত আঁটোসাঁটো। কৌশলগত দিক দিয়ে চীন এতোদিন ভারতকে ঘিরে ফেলার নীতি নিয়েছিল। এবার ভারত পালটা ব্যবস্থা নিচ্ছে। দক্ষিণ চীন সাগর, ভারত মহাসাগর এবং মালাক্কা প্রণালী অঞ্চলে চীনের আগ্রাসী কার্যকলাপ আটকাতে ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া Quadrilateral Secutity Dialoge বা QUAD-কে আরও শক্তিশালী ও কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণ কোরিয়াও এই অ-আনুষ্ঠানিক জোটের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। ফলে ভারত নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চাপে আছে চীনই। সর্বোপরি চীনের উহান প্রদেশ থেকে গোটা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়া, বিশ্বব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, বিশ্ব অর্থনীতির বিপর্যয় প্রভৃতির কারণে চীন এবং তার স্বৈরাচারী নেতাদের কার্যকলাপ গোটা পৃথিবীর মানুষের নজরে। ফলে বিশ্বরাজনীতিতে সবচেয়ে বেকায়দায় আছে চীন। চীনের অভ্যন্তরীণ সংকটও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই অবস্থা থেকে নজর ঘোরাতে চীন ভারতের সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করছে, দক্ষিণ চীনসাগর অঞ্চলে অশান্তি তৈরি করে চলেছে ধারাভাহিকভাবেই।

কিন্তু ১৯৬২ সালের পরিস্থিতির সঙ্গে ২০২০ সালের পরিস্থিতির কোনো তুলনাই চলে না। ভারত এখন এনডিএ সরকার ও তার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শক্তিশালী হাতে অনেক সুরক্ষিত। ভারত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। চীনের মতলব সম্পর্কেও ভারত এখন যথেষ্ট অবগত। এই ভারতকে চীন বুঝতে পারেনি। এবার চীনেরই পশ্চাদপসরণের পালা।

(লেখক কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

এই মুহূর্তে পাহাড়ের সমরে অ্যাডভান্টেজ ভারত

স্বপন দাস

চীন-ভারত সীমান্ত উত্তেজনা খুব যে সহজে প্রশমিত হবে, সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই বিরোধীদের কাছে যে বার্তা ও সীমান্ত সমস্যার যে কথাগুলি তুলে ধরেছেন, সেগুলি থেকে মোটামুটি পরিস্কার হয়ে গেছে। চীন বারে বারে এই সমস্যা তৈরি করছে, আমাদের সেনা সেই প্ররোচনাতে পা না দিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় সেই উস্কানির জবাব দিচ্ছে। বিরোধীদের কাছ থেকে প্রশ্ন উঠে এসেছে যে চীনের দখল করা জমি কেন ফেরতের চেষ্টা করা হচ্ছে না। বা সেই দখল করা জমি কীভাবে ফেরত নেওয়া হবে সেই বিষয় নিয়েও কেন বলা হচ্ছে না কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে। এর উত্তর অনেক আগেই ভারতের সেনাবাহিনী দিয়েই দিয়েছে। তারা বেশ কিছু পাহাড় চুড়া ইতিমধ্যেই নিজেদের দখলে নিয়ে একেবারে বাজপাখির চোখ দিয়ে শত্রুকে লক্ষ্য রেখে চলেছে। সেনাবাহিনীর তরফে এই বিষয়টাতে এতটাই জোর দেওয়া হয়েছিল, যে এই বিষয়ে দক্ষ সেনা ব্যাটেলিয়ন, ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার ফোর্স ও স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল চীনের দখল করা প্যাং গং লেকের চারপাশটাকে ঘিরে ফেলতে একবারে ওপর থেকে, মানে পাহাড়চূড়া থেকে। তারা তেমনটাই করেছে। আশপাশের প্রায় সবকটা শৃঙ্গ তারা নিজেদের আয়ত্তে এনে ফেলেছে। এই স্ট্র্যাটেজিতে অনেকটাই পিছনে চলে গেছে চীন। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে র‍্যাফায়েলকে। একেবারে ওপর থেকে সেই বাজপাখির মতো করে আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করে দেবার ক্ষমতা এখন অনেকটাই ভারতের হাতে।

অনেকে, বিশেষ করে কিছু বিরোধী মানুষ ১৯৬২ সালের চীন- ভারত যুদ্ধের প্রসঙ্গ সামনে আনতে চাইছেন। তাদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, সেদিনের ভারত আর আজকের ভারতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তাফাত। দুই দেশ এখন পরমাণু অস্ত্র সমেত নানা অস্ত্রে বলীয়ান। চীন যদি সম্মুখ সমরে আসে যোগ্য জবাব দেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই মত র‍্যাফায়েল যেদিন জাতির উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ তুলে দিলেন। সেদিন তিনি বলেই দিলেন, যারা ভারতকে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, তাদের যোগ্য জবাব দেবে ভারত। তিনি আরও বলেন, যারা ভারতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সন্ত্রাসের পরিবেশ রচনা করতে চাইছে, তাদেরকেও যোগ্য জবাব দেবার ক্ষমতা ভারত রাখে।

চীনের অবস্থান যে প্যাং গং লেককে ঘিরে, তাঁর চার পাশ, মানে ব্ল্যাক টপ, হেলমেট, গুরুং হিল, মাগর হিল, রেজাং লা, মুখাপারি, রেচিন লা, চুভুল সাব সেক্টরের তিনটি প্রধান চূড়ায় ঘাঁটি গেড়ে ফেলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই জায়গাগুলি অন্তত ভারতকে যুদ্ধের

ক্ষেত্রে সুবিধাজনক একটা অবস্থানে ইতিমধ্যেই নিয়ে গেছে।

১৯৬২ সালের যুদ্ধেও আমেরিকাকে পাশে পেয়েছিল ভারত, সেবার ভারত পিছু হটেছিল। এই প্রসঙ্গও ফিরে আসছে। সেই সময়ের বিচারে, আমেরিকা ভারতকে সেইভাবে সেই সময়ে সাহায্য করতে পারেনি, তার কারণ ছিল কিউবা ও রাশিয়াকে নিয়ে মাথাব্যথা। এবারের পরিস্থিতি কিন্তু তা নয়। আমেরিকা এমনকী রাশিয়া, সঙ্গে আছে ইজরায়েল। ফলে মিলিত শক্তির হিসেব যদি করা হয়, তাহলে সেই শক্তি কিন্তু সারা বিশ্বের কাছে খুব একটা কম নয়। ভারত নিজেও নানা কারণে শক্তিধর। সেটাকেও অবজ্ঞা করলে চলবে না। ফলে বিরোধীরা নানা বিষয় নিয়ে যেসব প্রশ্ন তুলছে, তাঁর উত্তর ইতিমধ্যেই নানা পত্রপত্রিকায় যেমন প্রকাশিত, তেমনি প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকেও বারে বারে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সূচগ্র মেদিনী চীন কেন, অন্য কারোর দখলদারিতে যেতে দেবে না ভারত। ফলে এই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই বিরোধীরা অনেকটাই ম্রিয়মাণ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তনেরাও বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, নানা কারণে এগিয়ে রেখেছেন। তাঁর মধ্যে, এই মুহূর্তে লাদাখের আবহাওয়ার সঙ্গে প্রথমে মানিয়ে নিতে হবে দু' পক্ষের সেনাবাহিনীকে। তারপর চিন্তা এগিয়ে যাওয়ার। এক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী অনেকটাই এগিয়ে, কেননা ওই আবহাওয়াকে মানিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতেও লড়াই করার ক্ষমতা রাখে ভারতীয় বাহিনী। যেটা চীনের বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া সবাই মনে করছেন, চীন যুদ্ধের পরিস্থিতি শুরু করলেই পাকিস্তান পিছন থেকে আঘাত হানবে। সেক্ষেত্রে ভারতীয় বাহিনী দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এখানে তারা বিশেষ জোর দিয়েছেন, এই মুহূর্তে আরও বাহিনী এই অঞ্চলে বাড়াতে। সেভাবেই এগোচ্ছে ভারতীয় সেনা। এখানে অনেকটাই তাদের সাহায্য করবে ভারতীয় বাহিনীর যুদ্ধকৌশল ও বিমানবাহিনী। যেখানে আছে সুখোই ও র‍্যাফায়েলের মতো যুদ্ধবিমান। সঙ্গে ভারতের একেবারে নিজস্ব মিসাইল টেকনোলজিও অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে ভারতকে। স্থলযুদ্ধের ক্ষেত্রেও ইজরায়েলের কাছ থেকে শেখা কৌশলের সদব্যবহার করবে ভারত। সেই কমজোরি ভেবে এগোলে ভুল করবে চীন।

ইতিমধ্যেই ভারত লাদাখ অঞ্চলে বেশ কিছু সড়ক পথ বানিয়ে ফেলেছে। যেখান দিয়ে রদস থেকে সব কিছুই খুব সহজে সরবরাহ হবে ওই পাড়াড়ে চূড়ায়। ওপর থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা এই মুহূর্তে লালবাহিনীর কাছে নেই। ফলে লালবাহিনীও জানে, যতই যুদ্ধ যুদ্ধ চিৎকার করে গলা ফাটাক না কেন, আদতে যে ক্ষতি তাদের হবে, সেটা তারা জেনেই গেছে।

এই মুহূর্তে করোনা নিয়ে চীন সারা বিশ্বে প্রায় একঘরে। সেখানে তারা সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালে সেই হাত ধরার মতো খুব কম সংখ্যক দেশ এগোবে। ভারত গোড়া থেকেই এই সীমান্ত বিষয় নিয়ে নানা কূটনৈতিক চালে দিশেহারা করে দিয়েছে চীনকে। সেদিক দিয়েও ভারতের সৌহার্দ্য ও সৌজন্যের দিকটাও নানাদেশের কাছে ভারতের ভূমিকাকেও একেবারে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। ভারত শান্তিপূর্ণভাবে এর মীমাংসার জন্য আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সেটার দিকেও সারা বিশ্ব অধির আগ্রহে তাকিয়ে দেখছে। এবং চীনের আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দা করতে শুরু করেছে।

মনে রাখতে হবে, লাদাখে দাঁড়িয়ে দু'পক্ষই। সেই জায়গায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাডভ্যান্টেজে ভারত রয়েছে। চীন নয়। চীন অধিকৃত জমি, সেটাও ফেরানোর মতো ক্ষমতা এই মুহূর্তে ভারতের আছে। সেটা প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়েও দিয়েছেন। তবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি, যা কিনা সেই জোট নিরপেক্ষতাকে সম্মান করে আর ভারতের সেই নীতি যা কিনা যুদ্ধ নয় শান্তির পক্ষে। সেই কারণে হয়তো বাহুবলে ফেরতের থেকে সময়কে সামনে রেখে ধীরে চল নীতির পক্ষেই সায় দিচ্ছে। ■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

বিশেষ নিবন্ধ

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে

চীন গরিব দেশগুলোকে ঋণের জালে জর্জরিত করে এমনকী ঋণগ্রস্ত দেশের ভূমি পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা বন্দর ৯৯ বছর লিজে দখল নেওয়া তারই উদাহরণ। এভাবে আফ্রিকান দেশ জিবুতিতে গড়ে তুলেছে সামরিক ঘাঁটি। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন হাম্বান টোটা বন্দর চীনের কাছে ইজারা দেওয়া ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত'।

তৃতীয় পর্ব

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকার পর ভারত-চীন সংঘাতের প্রেক্ষাপটে হঠাৎ করেই চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চাইনিজ ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে (সিইআইজেড) উন্নয়ন কাজ শুরুর সবুজ সংকেত দিয়েছে চীনের রাষ্ট্র মালিকানাধীন কোম্পানি চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড।

২০১৪ সালে বেইজিং সফরে গিয়ে প্রথম চীনা কর্তৃপক্ষকে এই জোনের প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে চীনের জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি এতে অনুমোদন দেয়। এরপর বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং চায়না হারবার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পথে এগোয়। চায়না হারবার এই প্রকল্পে ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগে রাজি হয়। বাংলাদেশ সরকার বরাদ্দ করে ৫০ বিলিয়ন ডলার।

এরপর থেকে আর কোনও অগ্রগতি দেখা যায়নি। লাদাখ নিয়ে সংঘাতের মধ্যে হঠাৎ নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে হঠাৎ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কাছে চিঠি লেখে চায়না হারবার। ওই চিঠিতে প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য চুক্তি সইয়ের কথা বলা হয়। যৌথ এই প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগকারী ওই কোম্পানির অংশীদারিত্ব থাকবে ৭০ শতাংশ। বাকি ৩০ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকবে বাংলাদেশ সরকারের।

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় ৮০০ হেক্টরের চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চলটি অবস্থিত চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরের কাছেই, যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সমুদ্র বন্দর। এটি রেলওয়ে স্টেশনের পাশাপাশি জাতীয় মহাসড়কের সঙ্গেও ভালোভাবে সংযুক্ত। সেই সঙ্গে চীনা অর্থনৈতিক ও শিল্প অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্যে যাতায়াতের সময়কে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দেবে কর্ণফুলি টানেল। চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরও এই অর্থনৈতিক অঞ্চল থেকে মাত্র ২০ কিমি দূরে অবস্থিত। এমনই একটি প্রধান ও অবকাঠামোগতভাবে সক্ষম অর্থনৈতিক অঞ্চল চীনকে দেওয়া হয়েছে, যাতে চীনের বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলো সফলভাবে তা পরিচালনা করতে পারে।

কর্ণফুলি নদীর ওপর নির্মিত কর্ণফুলি টানেল বাংলাদেশের প্রথম ডুবো টানেল, যা জেলার উত্তর ও দক্ষিণের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ ভূচিত্র চিরতরে বদলে দেবে। এই টানেল নির্মাণে ৭০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে চীন। বাকি অর্থ বাংলাদেশ সরকারই ব্যয় করবে। করোনা ভাইরাস মহামারী সত্ত্বেও ওই টানেলের বিভিন্ন অংশে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে চীনা কমিউনিকেশন ও কনস্ট্রাকশন কোম্পানি। প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে বোরিং মেশিন-সহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি মহামারীর মধ্যেও চীন থেকে নিয়মিত আসছে সেখানে। আনোয়ারায় একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে। নির্ধারিত ২০২২ সালের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ শেষ বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বঙ্গোপসাগরের বন্দরকে চীনের ইউনান প্রদেশের কুনমিংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সড়ক ও রেলপথও নির্মাণ করছে চীনা কোম্পানিগুলো। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ করছে চীনের সিনোহাইড্রো করপোরেশন। বন্দরের পার্শ্ববর্তী পটুয়াখালী ও বাঁশখালীতে কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রও নির্মিত হচ্ছে।

পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য যোগাযোগকে জরুরি হিসেবে নিয়ে এর ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে চীন ও বাংলাদেশ সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিয়ানমারের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম ও কুনমিংকে সংযুক্ত করতে ৯০০ কিলোমিটার মহাসড়ক নির্মাণের। এই মহাসড়ক বাংলাদেশকে চীনের মেকং উপ-অঞ্চলে প্রবেশের সুযোগ দেবে, যা দু' দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে এবং উভয় দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ করবে।

এই রুট নির্মাণের মাধ্যমে কৌশলগতভাবে চীন অনেক স্বার্থ হাসিল

করবে। কারণ এই রুট শুধু চীনের পূর্ব উপকূল থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত বিশাল সমুদ্র অধ্যায়কেই আয়ত্বে আনবে না, এটি পরিবহন খরচও অনেক কমিয়ে দেবে এবং ইউনান প্রদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। দ্বৈত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্য জাহাজের জন্য এবং উভয় দেশের নৌবাহিনীর জন্য চট্টগ্রাম বন্দর অবকাঠামোগত উন্নয়নে তাদের যৌথ উদ্যোগের সঙ্গে এটিও বেশ উপযুক্ত। উভয় দেশের বাণিজ্য জাহাজ ও নৌবাহিনীর দ্বৈত ব্যবহারের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নতির যৌথ উদ্যোগের ক্ষেত্রেও এটি যথোপযুক্ত।

বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নে বেশ কিছুদিন ধরেই চীন নিজেকে নিয়োজিত করলেও ভারত কার্যত এই অঞ্চলে চীনের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। চীন ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে ভারতকে ছাড়িয়ে গেছে। তখন থেকেই বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

চীন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকল্পে ৩৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, যার অধিকাংশই চূড়ান্ত হয়েছে ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের ঢাকা সফরের সময়। এমনকী এই বছরের জুলাই মাসেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ চীন সরকারের কাছে চিঠি লিখে ৯টি প্রকল্পে ৬.৪ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করে। লক্ষ্যণীয়, ভারত ও চীনের সংঘাতের সময়কালে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের তুলনায় নিজস্ব ঘরোয়া প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে ঢাকা, এমনই বলা হচ্ছে সরকারের তরফে। এই সুযোগে চীন আস্তে আস্তে হাত বাড়াচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে।

এমন অবস্থায় ভারতের উপস্থিতি অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছে বলে মনে করছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এক হাজার হেক্টরের এই অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে ভারতের সঙ্গে ২০১৫ সালে বেজার চুক্তি হলেও এর উন্নয়নমূলক কাজ তেমন এগোয়নি। ভারতীয় সংস্থা আদানি পোর্টস ও স্পেশাল ইকোনোমিক জোন লিমিটেডকে এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত ১১৫ মিলিয়ন ডলারও সরবরাহ করেছে।

জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং ভারতীয় বিনিয়োগকারী কোম্পানির মধ্যে যৌথ উদ্যোগ চুক্তি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা চলছে। বেজার নথি অনুযায়ী, প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প পরিচালনা পরামর্শদাতাদের নিয়োগের পদক্ষেপ এখন চলছে। এই লক্ষ্যে গত জুনে ভারতের এক্সিম ব্যাঙ্কে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, চীন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের দুর্বলতার সুযোগ ব্যবহার করতে দ্রুতগতিতে যেভাবে এগিয়ে চলেছে, ভারত সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

একদিকে চট্টগ্রাম, অন্যদিকে তিস্তাকে ঘিরে রচিত হচ্ছে নতুন ইতিহাস। নতুন পরিকল্পনা। প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে। চীন এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিনিয়োগ করছে। তিস্তা নদী ঘিরে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ভারতের সঙ্গে তিস্তা নদীর জল নিয়ে চুক্তির খুব একটা প্রয়োজন হবে না। ইতোমধ্যে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে তিস্তা প্রকল্পে চীনা বিনিয়োগে ভারত চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

একটু পেছন ফিরে তাকাতে হয়। ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের ঢাকা সফরে তিস্তা জল চুক্তি সই হওয়ার কথা ছিল। সব ঠিকঠাক থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অজ্ঞাত কারণে শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশ সফরে না আসায় তা সম্ভব হয়নি। পরে ২০১৫ সালে মমতা ঢাকায় এলেও তিস্তার জল দেওয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দেন। তবে তিনি সেই সময় বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ও বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিক দিক থেকে একে অপরের অকৃত্রিম বন্ধু। পশ্চিমবঙ্গ এমন কিছু করবে না যাতে বাংলাদেশের মানুষের ক্ষতি হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে নানাভাবে চেষ্টা করেন তিস্তা চুক্তি সই করতে। তিনি বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। ছিটমহল সমস্যার সমাধান তাঁর আমলেই হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর অনমনীয় মনোভাবের কারণে তিস্তা এগোয়নি। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন। এই ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকারের কথাও জানিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যে জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় এলে চীন সরকারের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে যান। সেই সময় চীনের সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে বেশ কয়টি দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি ও স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেই সময় শেখ হাসিনা এক সময় চীনের অভিশাপ বলে বর্ণিত হোয়াং হো নদী নিয়ন্ত্রণ করে চীনের আশীর্বাদে পরিণত করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের তিস্তাকে আশীর্বাদে রূপ দেওয়া যায় কিনা তার প্রস্তাব দেন। তদনুযায়ী চীন সরকার নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে দু' বছর ধরে তিস্তা নদীর ওপর সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষা শেষে একটি প্রকল্প নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। চায়না পাওয়ার নামের একটি প্রতিষ্ঠান এই সমীক্ষা চালায় ও নকশা প্রণয়ন করে। চীন এই প্রকল্পে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দিচ্ছে।

ভারত থেকে বাংলাদেশে যে ৫৪টি নদী প্রবেশ করেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে তিস্তা। এটি ভারতের সোলামো লেক থেকে উৎপত্তি হওয়ার পর সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রংপুর জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি চিলমারীর কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বাংলাদেশে তিস্তা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার। ১৯৮৭ সালের পর থেকে তিস্তার জল নিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের কোনো চুক্তি নেই। অভিযোগ করা হয়েছে, দীর্ঘদিন থেকে তিস্তা চুক্তি নিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ আলোচনা করতে চাইলেও কোনো ইতিবাচক অগ্রগতি হয়নি।

শেখ হাসিনা সরকার তিস্তা নদীর বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে চান না। বাংলাদেশ তিস্তা নদীর জল চুক্তির বিষয়টির বিকল্প হিসেবে তিস্তা নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, ভাঙন রোধ ও দু' পাড়ে গাইড বাঁধ নির্মাণ করার চিন্তা করছে। তিস্তা নদীর বর্তমান নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। তাই তিস্তা নদীর প্রশস্ততা কোথাও ৮ কিলোমিটার কোথাও আবার ১২ কিলোমিটার। শুষ্ক মৌসুমে জল শুকিয়ে গেলে মরুভূমির মতো রূপ নেয়। এই পরিকল্পনায় তিস্তা নদীর গভীরতা বাড়াতে খনন কাজ করা হবে। নদীর গভীরতা আরও প্রায় ১০ মিটার বৃদ্ধি করা হবে। মূল কথা সারাবছর নৌ চলাচলের মতো জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এই সংরক্ষিত জল দিয়ে নদী পাড়ের পুনরুদ্ধার হওয়া লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা যাবে। গড়ে উঠবে আধুনিক কৃষি খামার ব্যবস্থা। তিস্তা নিয়ে পরিকল্পনাকে এভাবেই বর্ণনা করা হচ্ছে। শেখ হাসিনা উন্নয়নের ওপর জোর দিলেও চীন দ্রুত এগিয়ে এসেছে তার নিজস্ব লক্ষ্য নিয়ে। ■

বিশেষ প্রতিবেদন

মোদী সরকার সেনার আধুনিকীকরণে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে

ডাঃ আর এন দাস

দু' হাজার বছর পর আধুনিক ভারতের চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশামাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে চীন ও পাকিস্তানের মতো প্রতিবেশী শত্রুর মোকাবিলায় তিন দশকের ২৫০ বিলিয়ন ডলারের বকেয়া কাজের নিষ্পত্তি করে ভারতীয় সেনার আধুনিকীকরণের দিকে দ্রুতগতিতে এগোচ্ছেন।

এক বছরে তিনবার স্থলবাহিনীর ৬৬০ মিলিয়ন ডলারের অগ্নিবর্ষী কামানের নির্দেশ দিয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। সাংবাদিক চিত্রা সুব্রমণিয়মের ফাঁস করাতে সোনিয়াজীর ভাই অট্টাভিও কাত্রোচির কারণে রাজীব গান্ধীকে এপ্রিল ১৯৮৭-তে সুইডেনের ১৫৫ মিমি হাউৎজার বফর্স কামানের ১.৪ বিলিয়ন ডলার ঘুষ-কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে নির্বাচনে হার স্বীকার করতে হয়।

মোদীজী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ২০১৬ সালেই পাঁচ হাজার কোটি মূল্যের ১৫৫ মিমির এম-৭৭৭ হাউৎজার কামানের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এটা আর্টিলারি বিভাগের অত্যাবশ্যক অস্ত্র। প্রথমের ২৫টি সরাসরি চলে এসেছে ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্তে 'লাইন অব আকচুয়াল কন্ট্রোলে'। বাকিগুলি ভারতেরই মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা কোম্পানির সহযোগিতায় তৈরি হবে স্বদেশি কাঁচা মালে। তাছাড়া এখন অন্য হাউৎজার কামানগুলিও স্থানীয় তাপমাত্রায় খাপ খাইয়ে, দক্ষিণ কোরিয়ার হানওয়া টেকইন কোম্পানি ভারতীয় লারসেন- টুব্রোর সঙ্গে ভারতেই উৎপাদন করছে। এটিএজিএস কামানও তৈরি করছে এখন ভারত স্বদেশি কোম্পানির মাধ্যমে। দেশীয় শত্রুর বিদেশি অস্ত্রে বিরাগ, আমলাতন্ত্রের লালফিতার ফাঁর ও স্থাল, নৌ ও বিমানবাহিনীর জরুরি অস্ত্রের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া'ই হলো এর একমাত্র সমাধান! সংবাদসূত্র অনুযায়ী, লারসেন টুব্রোর ১০০টা তোপের মঞ্জুরি এখনও পারচেস কমিটিতেই আটকে রয়েছে। সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিত মুখার্জির কথায়, 'প্রতিরক্ষা ও অর্থমন্ত্রকের বাবুরাই শেষ কথা। পাহাড় বা সমতলের সীমান্তে আধুনিক আর্টিলারির অত্যন্ত আবশ্যক হলেও দু'চার বছরের আগে দেশে পৌঁছাবে না।

দুঃখের বিষয়, দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করার উপযুক্ত অস্ত্রই ছিল না ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধে কিংবা ১৯৯৯-তে কারগিল যুদ্ধে। কারগিল যুদ্ধের হতভাগ্য বিধবাদের জন্য সংরক্ষিত কোলাবার, আদর্শ হাউসিং সোসাইটির ৩১ তলা বাসস্থান কেলেঙ্কারিতে জড়িত কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী অশোক চৌহানকে সিবিআই ১২০ (ফৌজদারি ষড়যন্ত্র) ধারায় অপরাধী ঘোষিত করলে ২০১০ সালে পদত্যাগ করতে হয়। কারগিলের মৃত সৈনিকদের আমেরিকা নির্মিত অ্যালুমিনিয়ামের আড়াই হাজার ডলার মূল্যের ৫০০ কফিন কেলেঙ্কারিতে ধৃত তিন সামরিক অফিসার অপরাধী হলেও সাক্ষী ও প্রমাণের অভাবে বেকসুর মুক্তি পায় কংগ্রেসের দয়ায়।

ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি জেপি নাড্ডা রাজস্থান ও তেলেঙ্গানায় রাজনৈতিক সমাবেশে বক্তৃতা দেবার সময় দুঃখের সঙ্গে অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বিপক্ষের দলনেতারা দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করছেন না, সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপের সমালোচনা করে দেশের জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন ও সেনাবাহিনীর সক্ষমতার উপর কটাক্ষ করে তাদের মনোবলকে ভেঙে দিচ্ছেন। লাদাখে ২০ জন শহিদের শোকের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর মুণ্ডপাতে উদগ্রীব হচ্ছেন। সংকট মুহূর্তে কংগ্রেস ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর

পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন সব পার্টির প্রধানরাই। সর্বপার্টি বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী তার নির্বুদ্ধিতার জন্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। মেঘালয়, সিকিম, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানার নন-বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীরাও মোদীজীর ভূমিকার প্রশংসা করে দেশের স্বার্থে দলাদলি না করে, ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সঙ্ঘবদ্ধতার ডাক দিয়েছেন। কিন্তু শোনা যাচ্ছে, কংগ্রেসের সঙ্গে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গোপন আঁতাত চলছে যাতে দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোকে দেওয়া বিবৃতি থেকে জানা যায়, ভারতের ২০২০-২০২১ সালের অভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা বাজেট মোদীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সারা ভারতের শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও পরিকাঠামো নির্মাণাদির জন্য বাজেটে ৩০ লক্ষ ৪২ হাজার কোটি বরাদ্দ হয়েছে। তার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭১,৩৭৮ হাজার কোটি মানে ১৫.৪৯ শতাংশ প্রতিরক্ষা বাজেটে খরচ।

গত অর্থবর্ষে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনজীর প্রতিরক্ষা বাজেটের ৬১.৯৬ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় এবছরে ৫.৮ শতাংশ বাড়ালেও মুদ্রাস্ফীতির হার এবং বর্ধিত বার্ষিক চাহিদার তুলনায় তা নিতান্তই নগণ্য। গত বছর সেবানিবৃত সেনা অফিসারদের পেনশন ছিল ৪.৩১ লক্ষ কোটি। এ বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৭১ লক্ষ কোটি অর্থাৎ ১৩.৫ শতাংশ বেড়েছে। আশ্চর্যভাবে ৬০ শতাংশ খরচ হয় বেতনেই। মাত্র ৪০ শতাংশ খরচ হয় নতুন অস্ত্রক্রয়ে এবং পুরাতন অস্ত্রের রক্ষাণাবেক্ষণে। ভারতের ৪৯ লক্ষ বেতনভোগী সেনার মধ্যে ৩১ লক্ষই হচ্ছেন পেনশনভোগী। বাকি ১৪ লক্ষ সক্রিয় ও কার্যরত এবং ৪ লক্ষ পার্শ্বসেনা। বর্তমান সিডিএস বিপিন রাউতের প্রস্তাবনায় সেনাদের ৩৫-৪০ বছরেই অবসর গ্রহণ না করিয়ে বয়ঃসীমা বৃদ্ধিতে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আগামী ২০-২১ সালের বাজেটে ৩.৩৭ কোটি মূলধন ব্যয়ের মধ্যে ১.১৮ কোটি প্রতিরক্ষা খাতে ও রাজস্ব ব্যয়ে ২.১৮ কোটি যা পেনশন, বেতন ও মেনটেনেন্সের খরচ।

২০১৯ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার দেওয়া উন্নতমানের এফ-১৬-র সাহায্যে পাকিস্তান ভারতের সীমা লঙ্ঘন করলে বীরচক্রে ভূষিত ফাইটার পাইলট অভিনন্দন বর্তমান পুরাতন মিগ-২১-র সাহায্যেই তাকে ধরাশায়ী করেন। গত বছর বিমানবাহিনীর ভাগ্যে এসেছিল মাত্র ১.১৩ কোটির ৩৮ শতাংশ মানে মাত্র ৪৩,২৮১ কোটি। ফ্রান্সের ৩৬টি রাফেল, আমেরিকার আক্রমণকারী অ্যাপাচে ও ভারবহনকারী চিনুক হেলিকপ্টার এবং রাশিয়ার এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের চুক্তি হয়েছিল ৪৭,০০০ কোটিতে। কিন্তু টাকার অভাবে অস্ত্রও আসবে না। এতে দু-তিন বছরের বিলম্বও হবে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায়। সম্প্রতি রাশিয়ায় গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী টেকনোলজি ট্রান্সফার-সহ ৭ লক্ষ ৭০ হাজার এ.কে-২০৩ অ্যাসল্ট রাইফেলের চুক্তি করেন। জরুরি ভিত্তিতে আমদানি হবে ১ লক্ষ। বাকিটা উত্তরপ্রদেশের কোরওয়ার অস্ত্রকারখানায় তৈরি হবে। দু' দেশের দুই প্রধান, পুতিন ও মোদীজীর সখ্যের নিশানা আর কী!

গত বছরে চীনের রক্ষাবাজেট ভারতের তিনগুণ ১৭৭.৬ বিলিয়ন ডলার ছিল। প্রতিবছরই ৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ বছর সেটা দাঁড়িয়েছে ২০০ বিলিয়ন ডলারে। গত বর্ষে ৩ লক্ষ কমিয়ে দিলেও চীনের আছে ২০ লক্ষের পৃথিবীর বৃহত্তম স্থলসেনা। শত্রু পরিবেষ্টিত চীন দক্ষিণ চীন সাগরে একাই 'রক্ষা করছে নকল বুঁদির গড়'। বেজিং থেকে লিউ ঝেনের ২০১৯ সালের লেখায় চীনের আধুনিকীকরণে পিএলএ-কে অর্ধেক করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ট্র্যাম্প অপমানিত হয়েও পৃথিবীর সর্বোচ্চ ৭৩৮ বিলিয়ন ডলারের রক্ষাবাজেট করেছেন আমেরিকায়। মোদীজী চিরসাথী ইজরাইলের নেতানিয়াহুর সঙ্গে ৭৭৭ মিলিয়ন ডলারের 'সারফেস-টু-এয়ার' বারাক-৮ মিসাইলের চুক্তি করেছেন। আমেরিকার থাডের চেয়েও উন্নত, ৮০ কিমি দূরের টার্গেটকে ধ্বংসকারী, ইজরায়েলি বারাক-৮ (হি:বজ্র) নৌবাহিনীকে অভেদ্য কবচ দান করেছে। ভারতের ডিআরডিও আর ইজরায়েলের এরোস্পেস ইন্ডাস্ট্রির যৌথ উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে ভারতেই। পূর্ববর্তী ছয় দশকের বকেয়া কাজগুলির অন্যতম সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের কাজ দীর্ঘ পদক্ষেপে মোদীজী এখন করছেন। প্রয়াত প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোহর পর্রিকরও অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিলেন। ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রক্ষাবাজেটে ইউপিএ-র তুলনায় একমাত্র মোদীজীই ৩ লক্ষ কোটির সীমা অতিক্রম করেছেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মোদীজীর উদ্যোগে ২০১৪-তে 'মেক-ইন-ইন্ডিয়ার' আহ্বানে ১৮২টি স্বদেশি ও বিদেশি কোম্পানির চুক্তি হয়েছে। ইউপিএ-র আমলে দোদুল্যমান অবস্থা ও গুরুত্বের অভাবে অনেক চুক্তি অকার্যকারী হয়েই পড়েছিল বহুদশক ধরে। চল্লিশ বছরের বকেয়া ৭৬ হাজার কোটির নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করা, 'ওয়ানর‍্যাঙ্ক ওয়ান পেনশন' মোদীজী ২০১৫ সালেই মিটিয়ে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত ২৬ লক্ষ সেনার এবং ৬০ হাজার শহিদের বিধবা-পেনশনও শুরু করেছেন ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে।

এতদিন পূর্ববর্তী সরকার সৈনিকদের সুযোগ-সুবিধা কিংবা সুরক্ষার দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। মোদীজী ৯ বছর ধরে ঠাণ্ডাঘরে পড়ে থাকা ৬৩৯ কোটির বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং ১৭০ কোটির হেলমেটের ব্যবস্থা করে সেনাদের সুরক্ষা ও সুবিধা করে দিয়েছেন। মেজর অনুপ মিশ্রের উদ্ভাবনায় ১০ মিটার দূর থেকে ছোঁড়া এ.কে-৪৭-এর গুলি থেকে রক্ষাকারী বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট এখন ভারতেই তৈরি হচ্ছে। মোদীজীর 'স্কিল ইন্ডিয়া'য় অনুপ্রাণিত হয়ে 'প্রোজেক্ট অভেদ্য' সারাবিশ্বে এই প্রথম এই অবিশ্বাসনীয় দুর্ভেদ্য আরমার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমবর্ষে তৈরি হয়েছে ৫০ হাজার বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট। ভারত এখন ১৮টি দেশেও রপ্তানি করছে। প্রতি বছর ১০ লক্ষ এই জ্যাকেট উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৫টি দেশি-বিদেশি কোম্পানিকে শ্রম ও শিল্পায়নের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

দেশপ্রাণ মোদীজী অত্যন্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের সঙ্গে দেশপ্রিমক অমরাত্মা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মারকসৌধ তৈরি করিয়েছেন। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালেই সম্পূর্ণ হয় ইন্ডিয়া গেটের কাছে ৪০ একর জমির উপর 'অমরচক্র ও বীরচক্র' যা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের যুদ্ধ, ১৯৬১-র গোয়া, ১৯৬২-র চীন-ভারত, ১৯৬৫-র ভারত- পাক, ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ, ১৯৮৭ সালের সিয়াচীন, ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে শহিদ বীর জওয়ানদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে দেশ ও জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। পাশ্ববর্তী প্রিন্সেস পার্কের ৯ একর জমিতে আরও একটা স্মারকস্মৃতি স্তম্ভ তৈরি করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ৩ লক্ষ ৬০ হাজার শহিদদের উদ্দেশ্যে। একজন দেশভক্ত প্রধানমন্ত্রীর কাছেই এ সমস্ত আশা করা যেতে পারে। তিনিই বিশ্বের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি প্রতি দেওয়ালিতে দুর্গম পর্বতশিখরে প্রহরারত অতন্দ্র বীরসেনানীদের সঙ্গে উৎসবে অংশগ্রহণ হয়েছেন।

সব থেকে বড়ো চুক্তি হয়েছে অত্যাধুনিক ফাইটার জেট রাফেলের। এটাও মোদীজী সেপ্টেম্বর ২০১৬-তেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাঁকগরনের সঙ্গে করে আসেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত অস্ত্রপ্রস্তুতকারী কোম্পানি 'ড্যসল্ট এভিএশন কোম্পানি'র সঙ্গে ৭.৮৭ বিলিয়ন ডলারের ৩৬টি রাফেলের চুক্তি করেন। এর মধ্যে প্রথম ক্ষেপে ৫টি আম্বালার এয়ার বেসক্যাম্পে পৌঁছে গেছে এবং ভারতীয় বায়ুসেনায় অভিষিক্তও হয়ে গেছে। আগামী অক্টোবরে আরও ৫টি আসছে যা পশ্চিমবঙ্গের হাসিমারা এয়ার বেসক্যাম্পে পূর্বপ্রান্তের সীমানা রক্ষায় অভেদ্য বর্মের মতো কাজ করবে। এই বিমানশক্তিই হবে ভারতের যুদ্ধজয়ের একমাত্র অস্ত্র। পৃথিবীতে এই মুহূর্তে এর সমতুল্য ৫ম জেনারেশনের ফাইটার জেট আর কারুর কাছেই নেই। আমেরিকার এফ-৩৫ কিংবা চীনের চেংদু-জে-২০-র থেকেও বেশি শক্তিশালী এই লড়াকু বিমান। বাকিগুলি আগামী দু'বছরের মধ্যেই ফ্রান্স থেকে ভারতে পৌঁছাবে। সঙ্গে থাকবে আরও ৬টি প্রশিক্ষণ রাফেল। ভারতীয় বিমানবাহিনীর দরকার ছিল ৪২টি স্কোয়াড্রনের। তা আজ পূর্ণ হতে চলেছে মোদীজীর প্রচেষ্টায়। ১৯৯০ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে সুখোই কেনার পর ভারতের বিমানবাহিনীতে আর কোনো ফাইটার জেটই কেনা হয়নি। কারণ ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। ভারতকে দুর্বল করে ৭ ভাগে বিভক্ত করার কুটিল ষড়যন্ত্রে দেশদ্রোহীদের সঙ্গে আমেরিকা, আরবদেশগুলি, চীন ও পাকিস্তান যুক্ত ছিল। কংগ্রেস- কমিউনিস্টরাই ছিল মূল পাণ্ডা। জনগণের ধারণা 'রাফেল চুক্তি' বিলম্বের অন্যতম কারণ নেহরুর যোগ্য উত্তরসূরি, নাতি ও কংগ্রেসের জোকার 'রাহুল গান্ধীর' দিল্লিতে চীনা রাজদূতদের সঙ্গে গোপন আঁতাত।

যাইহোক, শেষে মোদীজীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এবং দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে এই সংকট দূরীভূত হয়েছে। অতীতে ইউপিএ সরকারই বোয়িং পি-৮ পোসেইডন যুদ্ধবিমানকে টাকার অজুহাতে নাকচ করে দিয়েছিলেন কিন্তু মোদীজী ১ বিলিয়ন টাকায় সেটার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ইউপিএ সরকার পুরানো মান্ধাতার

আমলের হেলিকপ্টার দিয়ে কাজ চালাচ্ছিল। মোদাজী সেপ্টেম্বর, ২০১৫-তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ৩.১ বিলিয়ন ডলারের ১৫টি চিনুক ও ২২টি এপাচে হেলিকপ্টারের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২০১৭ সালে ভারতেরই লারসেন অ্যান্ড ট্যুব্রো ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি ৫০ হাজার কোটি মূল্যের তেজস-মার্ক-১ লাইট কমব্যাট এয়ারক্র্যাফট বিএইচইএল, ডিআরডিও এবং ইন্ডিয়ান এয়োরনোটিক্স লিমিটেড কোম্পানির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি করেছে। আজ থেকে তিন দশক পরে ৮টি এই মারাত্মক যুদ্ধজাহাজ কেনা সম্ভব হয়েছে মোদীজীর প্রচেষ্টায়।

গত চার বছরে মানে ২০১৪ সলের দ্বিতীয় নির্বাচন জয়ের পর থেকেই মোদী সরকার অনেকগুলি মহত্ত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করেছেন। প্রাইভেট সেক্টরে প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রী নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যান। টাইমস অব ইন্ডিয়াতে ছাপা হয়েছে, ২০১৪-২০১৫ সালের মধ্যে ৪ লক্ষ কোটির বেশি টাকা লগ্নি হয়েছে ১৪০টি ছোটো, মাঝারি এবং বড়ো প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদনের শিল্প ও কলকারখানাগুলি খোলার ব্যবস্থাতে। এর মধ্যে ৯৬টির পরিযোজনায় খরচ হবে ২.৫ লক্ষ কোটি। দেশিয় উৎপাদনও এর মধ্যে শামিল হয়েছে। ১৫০টি বৈদেশিক চুক্তি হয়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকার। এছাড়া, এই চার বছরে পড়ে থাকা বকেয়া অনেক চুক্তির পুনরায় নবীকরণও করা হয়েছে।

নৌবাহিনীর বহুদিনের দাবি ছিল আধুনিক যুদ্ধপোত এবং পারমাণবিক শক্তি চালিত ফ্রিগেট ও সাবমেরিনের। গর্বের কথা, মোদীজীর উদ্যোগে, আণবিক শক্তি সম্পন্ন ৭টি ফ্রিগেট ও ৬টি সাবমেরিন উৎপাদনের চুক্তিতে স্বাক্ষর হয়েছে এবং ভারত সরকার ২০১৫ সালেই তা মঞ্জুর করেছে।

এখনও অনেক কিছু বাকি আছে। স্বদেশি কোম্পানির দ্বারা ভারতেই উৎপাদনের জন্য যেমন আমেরিকার প্রিডেটার ড্রোন, মাল্টিরোল হেলিকপ্টার, সাবমেরিন, ফাইটার জেট ইত্যাদি। সম্প্রতি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, আত্মনির্ভর ভারত আগামী ৩ বছরে ১৫০টিরও বেশি ছোটো, মাঝারি ও বড়ো সাইজের সামরিক কলকবজা ও স্পেয়ার পার্টস ভারতেই নির্মিত হবে। নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণের জন্যও মোদীজী অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। ■

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

অতিথি কলম

নৃপেন্দ্র মিশ্র

সত্তর বছরে পা দিলেন মোদী, কিন্তু তাঁর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস অটুট

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কী দেশ কী আন্তর্জাতিক দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর নেতৃত্বের জন্য স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁর কঠোর বিরোধীরাও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয়তা। তাঁর অনুগামীর সংখ্যা সর্বদা আলোচিত হয়। এই ২৪×৭ ঘণ্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকলেও মানুষটির চরিত্রের এমন কিছু অজানা দিক রয়ে গেছে যা পরিচিত ভাবমূর্তির সঙ্গে আদৌ মেলে না।

হলফ করে বলতে পারি, যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন তাঁরা এক বাক্যে মেনে নেবেন বৈষম্যমূলক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর তীব্র অনীহা। এই বিতৃষ্ণা প্রায় চরম স্তরে পরিলক্ষিত হয়। বহু সরকারি মিটিঙে বার বার দেখেছি যখন কেউ কোনো প্রকল্পকে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে চাইছেন যেখানে ঘুর পথে কোনো বিশেষ শ্রেণী বেশি উপকৃত হবে অর্থাৎ সমবণ্টন হবে না সেখানে তিনি সটান বিরোধিতা করেছেন। উদাহরণ দিয়ে 'জনধন' প্রকল্পের কথাই বলা যায় যেখানে চিরকাল বঞ্চিত মানুষদের হাতে তিনি সরাসরি সরকারি অর্থ তুলে দিতে চেয়েছেন। তাঁর এই বৈষম্যহীন প্রকল্প দেশব্যাপী প্রবাদপ্রতিম সাফল্য পেয়েছে। এই চলতি মহামারীর সময়েও এর কার্যকারিতা বোঝা গেছে যখন সরকারি প্রকল্পের অর্থ গরিবদের অ্যাকাউন্টগুলিতে ডিজিটালি চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, উজ্জ্বলা গ্যাস প্রকল্পের টাকা বা গ্রামীণ আবাস প্রকল্পের অনুদানের ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ বরাবর ছিল স্বচ্ছ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দপ্তরের একটাই কাজ নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ করা কোন বর্ণ, কোন ধর্মের লোক তা পাচ্ছে তা দেখা অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। সবকা বিকাশের অর্থ যথার্থই জাতির উন্নয়ন এটিই মোদীর কাজের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্র সিদ্ধি করতে তাঁকে প্রায়শই অত্যন্ত সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হয় যাতে ভারত অন্যান্য উন্নত দেশের সমসক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

মনে পড়বে, প্রথমবার শপথ নেওয়া মাত্রই তিনি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এতকালের সাউথ ব্লকের তথাকথিত পণ্ডিত যাঁরা তাঁকে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অপরিপক্ব বলে তকমা দিতে তৎপর ছিলেন তাঁরা অবাক হয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে তাঁর এই প্রচেষ্টায় হতবাক হয়ে যান। এই কাজের মাধ্যমে তিনি প্রথম দিনেই পরিষ্কার করে দেন সাউথ ব্লক পণ্ডিতদের হাতের পুতুল হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন না। ৭০ বছর ধরে বয়ে যাওয়া পররাষ্ট্রনীতির ঘোলা জল তিনি পরিশ্রুত করবেন। মোদীর পররাষ্ট্রনীতির প্রথম শর্ত শান্তি রক্ষা। কিন্তু তা কোনো মতেই দেশের সার্বভৌমত্বকে যেন বিঘ্নিত না করে। ১৩০ কোটি ভারতবাসীর উন্নয়নে যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। অতীতের আলস্য ঝেড়ে ফেলে ইজারায়েল ও তাইওয়ানের ক্ষেত্রে তাঁর ইতিবাচক ভূমিকায় পরিষ্কার হয়ে গেছে ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান। এই একই নীতির পরিপূরক তৎকালীন পাকপ্রধান নওয়াজ শরিফের আমন্ত্রণে চটজলদি লাহোর সফর। তিনি এই স্বাক্ষাৎকারের তাৎক্ষণিক মূল্য বা উপকার নিয়ে তুল্যমূল্য বিচার না করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। দোষ মোদীর নয়, এটি পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে সেখানকার বরাবরের কায়েমি স্বার্থ দু'দেশের এই শান্তি পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে অন্তর্ঘাতের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়। জাতীয় স্বার্থের সুরক্ষকাকে সর্বদা পাখির চোখ করে রাখার প্রক্রিয়ায় তাঁর নজরকাড়া সাফল্য আরব দুনিয়ায় সৌদি আরাবিয়া ও সম্মিলিত আরব আমীরশাহির সঙ্গে দীর্ঘদিন পর সুসম্পর্কের সূচনা।

উল্লেখযোগ্য ভাবে তাঁর সাম্প্রতিকতম ১৫ আগস্টের ভাষণে তিনি ভারতের সঙ্গে ভৌগোলিক সীমারেখা নেই এমন সব দেশের সঙ্গেও সম্পর্কের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই যে তিনি এই প্রচেষ্টায় নেমে পড়েছিলেন সেদিনের ভাষণে সেটি প্রথম জনসমক্ষে জানালেন। প্রমাণস্বরূপ আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, জাপান ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে লক্ষণীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ভারতের উপযুক্ত সম্মান ও অবস্থান নির্ধারণে বহু দেশই আজ ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। এর জলজ্যান্ত প্রমাণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী আসন পাওয়ার প্রশ্নে প্রায় সমস্ত সদস্য দেশগুলির ভারতকে সমর্থন।

মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দেশের এই মিলিত সমর্থন কখনই দেশের নিজস্বতা ও স্বার্থ বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত নয়। কিছুদিন আগেই আরসিইপি নামে বিশ্বের কয়েকটি দেশের মিলিত একটি সংগঠন থেকে ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ

প্রত্যাশামাফিক সংরক্ষিত নাও হতে পারে এই কারণে ভারত বেরিয়ে আসে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি সংরক্ষণবাদী হয়ে উঠবেন বা ভারত ভুবনীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধাচারী বলে পরিগণিত হবে এমন কোনো দ্বিধা তাঁর মধ্যে ছিল না। ভারতের এই অবস্থানে অনেক দেশের গুপ্ত উদ্দেশ্য সাধিত না হলেও তারা সোচ্চার প্রতিবাদ করতে পারেনি। এখানেই তাঁর সাফল্য।

একই রকমভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সমঝোতার সময় মোদী 'জলবায়ু পরিবর্তন' প্রসঙ্গে দেশের স্বার্থকে আদৌ খাটো করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি নির্ভয় এবং প্রচলিত ধ্যান- ধারণার বাইরে এসে দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাহীন। সীমান্ত লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তিনি চরম আপোশহীন ও নির্দিষ্ট দেশকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে তৎপর। লোকের মধ্যে প্রচলিত যে ধারণা রয়েছে যে, মোদী এমন একজন নেতা যিনি কোনো বিকল্প মত বা সাজেশান পছন্দ করেন না। তাঁরা শুনলে অবাক হবেন যে তাঁর সঙ্গে যাঁদের অজস্র মিটিং করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁরা জানেন তিনি ভিন্ন মত সম্পর্কেও বরাবরই এক প্রাণখোলা কথপোকথনে অভ্যস্ত। কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্পোরেট কেউই বলতে পারবেন না যে সাক্ষাৎকার চলাকালীন মনে হয়েছে তাঁর যেন তাড়া রয়েছে। সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে তিনি সমস্ত বক্তব্য শুনতে অভ্যস্ত। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ধাঁচার ওপর শ্রদ্ধাবশত এমনও ঘটেছে যে তাঁর নিজের ইচ্ছে অন্যরকম হলেও অনেক সময় তিনি মতৈক্যের ভিত্তিতে নেওয়া সিদ্ধান্তের পক্ষেই মত দিয়েছেন।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলি ২০১৬ সালে বিমুদ্রিকরণ সিদ্ধান্তের প্রাক্কালে নতুন ২০০০ টাকার নোট ঢালাও মুদ্রণে তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। এই মতকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু দ্রুত উচ্চমাত্রার নোট ছাপাতে পারলে বাজারে তাড়াতাড়ি টাকার জোগান স্বাভাবিক করা যাবে এই মতের প্রবর্তকদের ওকালতি তিনি মেনে নেন। ভবিষ্যতে কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। সিদ্ধান্তটা যে খুব পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না সেই দায় কখনও উপদেষ্টাদের ঘাড়ে চাপাননি। এখন তিনি ২ হাজার টাকার নোট ছাপানোতে রাশ টেনেছেন। আরও বলছি ব্যাঙ্কের সুদ নীতি, রাজস্ব ঘাটতি বা অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির (ব্যাঙ্ক ধরা যেতে পারে) পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তিনি যে সিদ্ধান্তগুলির ক্ষেত্রে পুরোপুরি একমত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সরকারি যৌথ পরিচালন ব্যবস্থার ওপর শ্রদ্ধাশীল থাকায় তিনি সর্বদাই এগুলির পেছনে দাঁড়িয়েছেন।

তিনি ৭০ বছর ছুঁলেন, কিন্তু তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস অটুট। চলতি বহুবিধ সমস্যার বহুমুখী আক্রমণ কখনই তাঁকে দমাতে পারেনি। তিনি উন্নয়ন ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির উদ্দেশে এগিয়ে চলেছেন। রাজ্য ও কেন্দ্রে সর্বোচ্চ পদে কাজ করার যুগপৎ অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার রয়েছে তাঁর। মানুষের সমস্যার নিত্য হিসেব রাখেন তিনি। এগুলিই তাঁর সম্পদ। ১৩০ কোটি দেশবাসীর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস যে কোনো জটিল সমস্যার সমাধানে তাঁর কাছে বিশল্যকরণীর মতো কাজ করে।

(লেখক প্রধান সচিব, পিএমও ২০১৪-২০১৯)

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্ধমান জেলা সঙ্ঘচালক অলক সাহা করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ১৪ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ কন্যা রেখে গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বর্ধমান শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। শাখার মুখ্যশিক্ষক, জেলা ব্যবস্থা প্রমুখ, জেলা কার্যবাহের দায়িত্বও তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন কবেছেন।

* * * *

পুরুলিয়া জেলা সঙ্ঘচালক সুরেশ কুমার লাট নিউমোনিয়া আক্রান্ত হয়ে গত ১৭ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি ১ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। পড়াশোনা শেষ করে তিনি দু'বছর কলকাতায় প্রচারক জীবন অতিবাহিত করেন। ফিরে গিয়ে পারিবারিক ব্যবসায় যুক্ত হন। পুরুলিয়া শহরের প্রতিষ্ঠিত ওষুধ ব্যবসায়ী ছিলেন।

* * * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের আসানসোল জেলার চিত্তরঞ্জন নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রমেন্দ্র কিশোর মজুমদার গত ২৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন করেন। তিনি ষটের দশকের স্বয়ংসেবক। চিত্তরঞ্জন নগরে শাখার মুখ্যশিক্ষক থেকে শুরু করে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে নগর কার্যবাহের দায়িত্ব সুচারু রূপে নির্বাহ করেন। তাঁর পুত্র অভিজিৎ মজুমদার এখন একটি খণ্ডের কার্যকর্তা।

গত ৮ সেপ্টেম্বর তাঁর স্মরণসভায় বৃক্ষরোপণ করে প্রকৃতি বন্দনার মাধ্যমে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। জেলা সঙ্ঘচালক নিরঞ্জন মাকুড় ও প্রান্ত প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ নিবন্ধ

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম!

এই বিভ্রান্তি দূর হওয়া প্রয়োজন

হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বরকে কোনোভাবেই সেমেটিক গ্রন্থসমূহে প্রতিপাদিত ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা চলে না।

ড. রাকেশ দাশ

অহিন্দু মতাদর্শগুলি বহুকাল যাবৎ হিন্দু সমাজের সাংস্কৃতিক একাত্মতাকে নষ্ট করার অপচেষ্টা করে চলেছে। এই অপচেষ্টার ফলস্বরূপ হিন্দু সমাজের মধ্যে বহু যুক্তিহীন, হাস্যকর এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বিচারধারা ব্যাপ্ত হয়েছে। বিশেষত, আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে বহু ভ্রান্ত ধারাণা সমাজে প্রচারিত হয়েছে। এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি আধ্যাত্মিকতার নামে সমাজের প্রাণভোমরা স্বরূপ সংস্কৃতিকে কলুষিত করছে এবং সামাজিক একাত্মতাকে ধ্বংস করছে।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে সামাজিক নিয়ম ও নীতি অত্যন্ত সুচিন্তিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মানুষ সামাজিক নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোর ভাবে পালন করতেন। এমনকী যারা নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন তারাও সামাজিক নিয়ম উলঙ্ঘনের প্রয়াস করলে তাকে দণ্ড দেওয়া হতো বা নির্বাসিত করা হতো। কোনো সামাজিক নিয়মের পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হলে বিশেষজ্ঞ ঋষিদের ডাক পড়ত। তাঁরা যথাযথ বিচার বিশ্লেষণের পরে প্রয়োজনীয় নিদান দিতেন। সামাজিক রীতির এই কঠোরতম কারণেই দীর্ঘকাল ধরে বৈদেশিক আক্রমণের পরেও হিন্দু সমাজ থেকে হিন্দুত্বের ভাবনা পুরোপুরি নষ্ট হয়নি। অপরপক্ষে দেখা যায় যে, সমগ্র আফ্রিকা সমেত মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন সম্প্রদায় ও তাদের সংস্কৃতি পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীন সংস্কৃতির অবশেষ স্বরূপ পারস্য জাতি এখনও পর্যন্ত কেবল ভারতবর্ষেই টিকে রয়েছে।

হিন্দু সমাজের এই সামাজিক কঠিনতার ঠিক বিপরীতে প্রত্যেক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক সাধনার পথে অসীম স্বাধীনতা উপভোগ করতেন। কিন্তু সেমেটিক মতবাদগুলিতে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোনো স্বাধীনতা কোনোদিনই ছিল না। এই কারণে এই সমস্ত মতবাদে আধ্যাত্মিকতার নামে হেভেন, জন্নত, হেল, জাহান্নুম, জাজমেন্ট ডে, কয়ামত প্রভৃতি কতগুলি অলীক বস্তুর যুক্তিহীন বালখিল্য কল্পনা ছাড়া কোনো গভীর তত্ত্বের বিকাশ ঘটেনি। কিন্তু ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চেতনার চরম বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এমতাবস্থায় ভারতবর্ষকে নিজেদের পদানত করার মানসে আগত অহিন্দু মতবাদের প্রচারকরা ভারতবর্ষের এই দুটি ব্যবস্থার (সামাজিক ও আধ্যাত্মিক) উপরে বৌদ্ধিক আক্রমণের পন্থা অবলম্বন করে। বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং সমাজের উপর বর্বরোচিত অত্যাচারের তাণ্ডবে সমাজে প্রাচীন শাস্ত্রের নামে কিছু কুপ্রথা প্রচলিত হয়। আক্রমণকারীরা এই প্রথাগুলিকে হাতিয়ার করে। তাদের কার্যপ্রণালীর দুটি সুস্পষ্ট ধারা দেখা যায়। প্রথমত, সমাজ সংস্কারের নামে হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় অবশ্যপালীয় নিয়মের উপরে মানুষের অনাস্থা সৃষ্টি করা। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে 'মানবতা'র বিরোধী প্রতিপন্ন করা। দ্বিতীয়ত, হিন্দু সংস্কৃতি তথা সমাজ ব্যবস্থার মূলভূত আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তগুলিকে জনমানস থেকে মুছে ফেলে অহিন্দু ভাবধারার প্রবেশ ঘটানো।

এখানে বলা রাখা ভালো যে, হিন্দু সমাজ থেকে কুপ্রথা দূর করে সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য সময়ে সময়ে রামানুজাচার্য, স্বামীনারায়ণ, স্বামী রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, রমণ মহর্ষি প্রমুখ সর্বদা যত্নশীল ছিলেন। তাঁরা হিন্দুত্বকে ভিত্তি করেই এই কুপ্রথা মুক্তির আন্দোলন করেছিলেন। অপরপক্ষে বৈদেশিক আক্রমণকারীরা হিন্দুত্বকেই কুপ্রথার ভিত্তি বলে প্রচার করে হিন্দুত্বকেই সমাজ থেকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে।

এই আক্রমণের দুটি কার্যধারা পরিলক্ষিত হয়। প্রথম ধারার অনুসারীরা ভারতীয় শাস্ত্রের বিভিন্ন শব্দ ও তত্ত্বের যথেচ্ছ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজকে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। যেমন--- ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি। অন্যদিকে আরেক দল আধ্যাত্মিকতাকে উপড়ে ফেলে তার জায়গায় উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করেছে। যেমন— ডিরোজিও'র নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী থেকে বামপন্থী নকশালরা। এই আক্রমণকারীরা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ প্রবর্তিত মেরুদণ্ডহীন কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় আদর্শ ও ভাবধারা সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরে অনাস্থা ও ভ্রান্তি ছড়াতে থেকেছে।

এই ধরনের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে হিন্দু সমাজে আধ্যাত্মিকতা ও তৎসম্পর্কীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপ্ত হয়েছে এবং ক্রমশ সমাজের অন্তর্মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের প্রাণস্পন্দন হলো হিন্দুত্ব বা হিন্দু সংস্কৃতি। হিন্দু সংস্কৃতির মূল আধ্যাত্মিকতা। সেই কারণে যথাশীঘ্র হিন্দু সমাজ থেকে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কিত ভ্রান্তিগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের নিরসন ও মূলোৎপাটন জরুরি।

দুশ্চিন্তার কথা হলো, সমাজে পরিব্যাপ্ত কুরীতিগুলিকে দূর করার জন্য বহু সামাজিক ও আধ্যাত্মপ্রেরিত সংগঠন কর্মরত হলেও, আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস অত্যন্ত নগণ্য। মঠে মন্দিরে পূজা, প্রবচন

ইত্যাদিতে পৌরাণিক কাহিনির কথকতা, ধর্মসভা আদি হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই প্রবচনগুলিতেও প্রচলিত সমস্ত ভ্রান্তির অনুরূপ ব্যাখ্যাই করা হচ্ছে। এর ফলে এই সমস্ত তথাকথিত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপেও ভ্রান্তি দূর হওয়ার বদলে সেগুলির দৃঢ়ীকরণই হয়ে থাকে। হিন্দু সমাজে বর্তমানে ঈশ্বর, অবতার, দেবতা, উপাসনা, স্বর্গ-নরক, সৃষ্টি ইত্যাদি নানা বিষয়ে প্রচুর ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি রয়েছে।

এমতাবস্থায় এই ভ্রমগুলিকে চিহ্নিত করে যে সমস্ত শব্দ বা তত্ত্ব সম্পর্কে ভ্রম রয়েছে সেগুলির যথাযথ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেই ভ্রান্তি নিরসনের প্রয়াস করা দরকার। সমাজের বর্তমান বৌদ্ধিক স্থিতির অনুকূল ভাবে সেই সমস্ত বিষয়গুলির যুগোপযোগী উপস্থাপনা দরকার। এই প্রবন্ধে আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারণার আলোচনা এবং শাস্ত্র অনুসারে তাদের নিরসনের প্রচেষ্টা করব।

হিন্দু সমাজে আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে কোনো কঠিন নিয়ম না থাকার দরুন এই বিষয়ে নানা মতবাদের বিকাশ ঘটেছে। যে কোনো ব্যক্তি নিজ রুচি অনুসারে এই মতবাদের অধ্যয়ন, তদনুসারী সম্প্রদায়ে নিজ নিষ্ঠা স্থাপন এবং তদনুসারী উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণে স্বাধীন। এই সাধনার ধারাগুলিকে আমরা আপাতত বোঝার সুবিধার জন্য পন্থ নামে চিহ্নিত করলাম। হিন্দু সমাজে আধ্যাত্মিক পন্থগুলিতে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ :

১. **দর্শন** : শাস্ত্রের বিশেষত বেদের অর্থ নির্ধারণ এবং বেদবাক্যে আপাত ভাবে প্রতীয়মান বিরোধ নিরসন পূর্বক সমন্বয়।

২. **সম্প্রদায়** : প্রাত্যহিক জীবনে অবশ্যপালীয় নিয়মের মধ্যে জীবনকে অনুশাসিত করা। এই নিয়মগুলি উপরোক্ত দর্শনের অনুসারী ধর্মশাস্ত্রে উপনিবদ্ধ থাকে।

৩. **উপাসনা** : দর্শনটিকে যথাযথ ভাবে অনুধাবন করা এবং সত্যকে জানার যথার্থ প্রয়াস।

বর্তমানে ভারতবর্ষে বহু পন্থ প্রচলিত আছে। প্রাচীন পন্থগুলির মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে অদ্বৈতমত অত্যন্ত সংগঠিত ও প্রবল। ভগবান শঙ্করাচার্য সমাজ জীবনে সফলভাবে অদ্বৈত ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এছাড়াও নিম্বার্কাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বল্লভাচার্য, স্বামীনারায়ণ, রামানন্দ, চৈতন্য, উপলদেব প্রমুখ আচার্য বিভিন্ন পন্থকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁরা সকলেই ঈশ্বর, অবতার, দেবতা প্রভৃতি বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত সমূহ যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত ও দর্শনগুলির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও কোনো দর্শনেই সৃষ্টির একাত্মতার বিরোধিতা করা হয়নি। সকলেই নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে সৃষ্টির একাত্মতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ সৃষ্টিকে ঈশ্বরের থেকে অভিন্ন বলেছেন, কেউ-বা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের শরীরের অংশ বলেছেন, কেউ-বা সৃষ্টিকে ঈশ্বরের লীলা বলে সৃষ্টিতে সমস্ত বৈষম্যের নিন্দা করেছেন।

হিন্দুশাত্র অনুসারী সমস্ত পন্থই ঈশ্বরের স্বরূপের বিষয়ে একমত। ঈশ্বর সর্বশক্তিসম্পন্ন, অজ্ঞান রূপী মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত, পূর্ণ জ্ঞান এবং অনন্ত বিভূতি সম্পন্ন। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই ঈশ্বরের শরীর। এই সমগ্র চরাচরে ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নেই।

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্তিগুলিকে নির্দেশ করে শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈত মত অনুসারে সেগুলির নিরসনের প্রয়াস করব।

ঈশ্বর বিষয়ক ভ্রান্তি :

১. ঈশ্বর বিষয়ে প্রবলতম ভ্রান্তিটি হলো— ‘ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম...’। এই বাক্যটির সহজ তাৎপর্য হলো, হিন্দুশাস্ত্রানুসারী পন্থগুলিতে যে ঈশ্বরের উপাসনা হয় ইসলাম, খ্রিস্টান প্রভৃতি সেমেটিক মতাদর্শেও সেই ঈশ্বরেরই উপাসনার কথা বলা হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (৪/১১)

যে আমাকে যেই রূপে ভজনা করে আমি তাকে সেই রূপেই ভজনা করি। হে পার্থ, সকলেই আমার নির্দেশিত পথেই চলেছে।

এই শ্লোকে ভগবান নিজেই সমস্ত প্রকার উপাসনাকেই তাঁর উপাসনা বলে নির্দেশ করেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও এই কথারই অনুবাদ করেছেন, ‘যত মত তত পথ’। সুতরাং কেউ যদি গড, আল্লাহ্ ইত্যাদি নামে কোনো গ্রন্থে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে তাকে ডাকে সে আসলে ঈশস্বরেরই উপাসনা করছে।

২. হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গাতে ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্তি বা রূপকল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সমস্ত রূপকল্পের মধ্যে কিছু রূপকল্প একেবারে অলীক ও অবাস্তব বলেই মনে হয়। যেমন, অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। সুতরাং সংশয় তৈরি হয় যে, ঈশ্বরের এই ধরনের রূপকল্পনা ভ্রান্ত। আসলে ঈশ্বর নিরাকার এবং নিরাকারেরই উপাসনা করা উচিত। বেদেও বলা হয়েছে, ‘অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্’ (কঠোপনিষৎ ১/৩/১৫) অর্থাৎ তিনি শব্দ, স্পর্শ রূপ রহিত অব্যয়। এই সমস্ত বাক্যে ঈশ্বরের নিরাকারতাই প্রতিপাদিত হয়েছে। সেমেটিক মতাদর্শগুলিতেও ঈশ্বরকে নিরাকার প্রতিপাদন করা হয়েছে। সুতরাং এই নিরাকার উপাসনাই আসলে হিন্দুশাস্ত্রে প্রতিপাদিত এবং সেটির সঙ্গে সেমেটিক মতের কোনো বিরোধ নেই। অন্য সমস্ত রকম সাধনার ধারা আসলে ভ্রান্ত।

এই দুটি ভ্রান্তির নিরসন ঘটলে অন্যান্য বহু ভ্রান্ত ধারণা স্বতঃ নিরস্ত হবে। এই দুটি হলো ঈশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভ্রান্তি এবং বিভ্রান্তির ভিত্তিভূমি।

ঈশ্বরের স্বরূপ—শাস্ত্র কী বলছেন :

বস্তুত, হিন্দুশাত্র অনুসারী সমস্ত পন্থই ঈশ্বরের স্বরূপের বিষয়ে একমত। ঈশ্বর সর্বশক্তিসম্পন্ন, অজ্ঞান রূপী মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত, পূর্ণ জ্ঞান এবং অনন্ত বিভূতি সম্পন্ন। সম্পূর্ণ সৃষ্টিই ঈশ্বরের শরীর। এই সমগ্র চরাচরে ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই নেই। ঈশ্বর সমস্ত জীবের মধ্যে বৈশ্বানর (গীতা ১৫/১৪) এবং অন্তর্যামী (গীতা ১৮/৬১) রূপে নিবিষ্ট হয়ে আছেন। যাদেরকে আমরা জড় বলি তাদের মধ্যেও চৈতন্য রূপে তিনি অনুস্যূত।

এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। ঈশ্বরের উপাসনার মার্গ ভিন্ন হলেও স্বরূপত, ঈশ্বর এক এবং তিনি

সমস্ত উপাসককেই কৃপা করেন।

হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও ঈশ্বরের সাকারত্বের নিষেধ করা হয়নি। হিন্দুশাস্ত্র মতে ঈশ্বর নিজ ইচ্ছা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হতে পারেন। তিনি কোনো নির্দিষ্ট রূপে, নির্দিষ্ট আকারে, এমনকী নিরাকারতায়ও সীমিত নন।

বস্তুত, এই আকার হলো মায়িক। মায়া বা অজ্ঞান থেকেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং নামের উৎপত্তি। মায়ার অধীনস্থ জীব মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রূপ এবং নাম গ্রহণ করে। কিন্তু ঈশ্বর মায়ার অধীন নন। বরং মায়া ঈশ্বরের অধীন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে—

অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বম্ এতৎ
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্ধি
মায়িনং তু মহেশ্বরম্।।(৪/৯-১০)

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য বলছেন— “নিজের মায়ায় কল্পিত এই পাঞ্চভৌতিক প্রপঞ্চে মায়ার দ্বারাই নানা রূপে বদ্ধ হয়ে অবিদ্যার বশবর্তী হয়ে সংসার সমুদ্র ভ্রমণ করছেন। জগতের কারণ স্বরূপ প্রতিপাদিত প্রকৃতিই হলো মায়া। মহান ঈশ্বর হলেন মহেশ্বর। তাঁকে মায়ী বলে জানবে অর্থাৎ মায়ার সত্তা এবং স্পন্দনের কারণ, মায়ার অধিষ্ঠান, মায়ার প্রেরক রূপে জানবে। এই পরমেশ্বরই দড়িতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মায়িক অবয়বের আরোপ দ্বারা ভূলোক আদি সমস্ত প্রপঞ্চে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন।”

অর্থাৎ ঈশ্বর নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্টি রচনা করে সেই সৃষ্টিতে স্বয়ং ব্যাপ্ত হয়েছেন। ঈশ্বর তাঁর অধীনস্থ মায়ার দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি রচনা করেন। সমস্ত দেহ, ইন্দ্রিয় থেকে শুরু করে সমস্ত প্রকৃতিই ঈশ্বরের বশীভূত। ঈশ্বর নিজ মায়াকে আশ্রয় করে ইচ্ছানুরূপ বহু রূপ ধারণ করেন। মহর্ষি বাদরায়ণ বিরচিত ব্রহ্মসূত্রের ‘অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ’ (১/১/২০) সূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য আরও বলেছেন— “পরমেশ্বর সাধকের অনুগ্রহের জন্য মায়াময় রূপ ধারণ করতেই পারেন... যেখানে সমস্ত বিশেষণের নিরসন পূর্বক পরমেশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে উপদেশ হলো ‘অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্’ ইত্যাদি। আবার সমস্ত কিছুর কারণভূত হওয়ার জন্য কিছু বিকারধর্ম বিশিষ্ট ঈশ্বরকেও উপাস্যরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন— ‘সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ’ (ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩/১৪/২) ইত্যাদি।”

সুতরাং মায়ার অধিপতি সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ঈশ্বরের সাকারতাতে শাস্ত্রের কোনো বিরোধ নেই। সেজন্য শ্রুতির বিভিন্ন অংশে, স্মৃতিতে, পুরাণে ঈশ্বরের যে সাকারত্ব এবং বিভিন্ন রূপকল্পনা করা হয়েছে তাতে কোনো অযৌক্তিকতা নেই। নিরাকার ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীত হন।

সেমেটিক মতের সঙ্গে বিরোধ :

এমতাবস্থায় ঈশ্বর সম্পর্কে সেমেটিক বিচারধারা হিন্দু ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

সেমেটিক মতে ঈশ্বর নিরাকার। ঈশ্বরের সাকারত্ব কল্পনা সেমেটিক মতে অক্ষম্য অপরাধ। বাইবেলের বহু জায়গাতে ঈশ্বরের কোনো নির্দিষ্ট রূপের উপাসনার নিষেধ করা হয়েছে। যেমন— “Theerfore, my dear friends, flee from idolatry." Corinthians 10 : 14; "Dear children, keep yourselves from idols." John 5 : 21. ইত্যাদি। এছাড়াও বাইবেলের Leviticus 19 : 4, Corinthians 10 : 7, Colossians 3 : 5, Isaiah 45 : 20, Judges 10 : 14, Leviticus 10 : 4, Galatians 4 : 8, Isaiah 44 : 9-20 প্রভৃতি স্থানে ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনার নিষেধ করা হয়েছে। এমনকী বাইবেলে এটিকে পাপ বলে নির্দেশ করে তাকে এই প্রথাকে সমাপ্ত করার জন্যও উস্কানি দেওয়া হয়েছে— “Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature : sexual immorality, impurity, lust, evil desires and freed, which is idolatry." (Colossians 3 : 5)।

একই ভাবে ইসলামেও ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনাকে শির্ক বলা হয়েছে। ঈশ্বর অতিরিক্ত কারও উপাসনার নিষেধ করা হয়েছে কোরানে। “যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। অতএব, আল্লাহ্‌র সঙ্গে তোমরা অন্য কাকেও সমকক্ষ করো না। বস্তুত এসব তোমরা জান।” (সুরা আল বাকারা (২), আয়াত ২২) “তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোনো উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।” (সুর যারিয়াত (৫১), আয়াত ৫১)। “এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। বলুন, মজা উপভোগ করে নাও। অতঃপর তোমাদেরকে অগ্নির দিকেই ফিরে যেতে হবে।” (সুরা ইব্রাহীম (১৪), আয়াত ৩০) (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মৌলানা মহিউদ্দিন খানের অনুবাদ)।

বাইবেলও ঈশ্বরের সাকারত্ব কল্পনাকে পাপ বলেছে, “Those who cling to worthless idols turn away from God's love for them." (Jonah 2.8)।

অন্যদিকে হিন্দুশাস্ত্র বলছে, ঈশ্বর স্বয়ং সাধকের অনুগ্রহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেন। এই রূপগুলি উপাসনার জন্যই প্রসিদ্ধ। এই রূপ বা মূর্তির উপাসনাতে সাধকের কল্যাণই হয়। গীতাতে ভগবান বলেছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।। (৯/২৩)

যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে অন্য দেবতাদের উপাসনা করে তারাও অজ্ঞানতার বশেই আমারই (অর্থাৎ পরমেশ্বরেরই) উপাসনা করে। (এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, পূজা বা যজ্ঞ মাত্রই উপাসনা নয়। পূজা বা যজ্ঞ কাম্যকর্মও হতে পারে আবার উপাসনাও হতে পারে। এই শ্লোকে উপাসনার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা থেকে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির কারণে বিরত থাকলাম।)

সুতরাং হিন্দুশাস্ত্র মতে বিভিন্ন রূপে ঈশ্বরের উপাসনা সাধকের কল্যাণ করে। অন্যদিকে সেমেটিক মতাদর্শে কোনো রূপের উপাসনা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ এবং সেটি পাপ।

সেমেটিক মত অনুযায়ী ঈশ্বরের রূপকল্পনাকারী এবং রূপবিশিষ্ট ঈশ্বরের উপসনাকারী অনন্তকাল দোযখের আগুনে পড়ে থাকবে। অন্যদিকে হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী উপাসক যে কোনো রূপেই ঈশ্বরের উপাসনা করুক না কেন ঈশ্বর তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সংসার সমুদ্র থেকে উদ্ধার করেন। সেমেটিক মত অনুসারে ঈশ্বরের উপাসনার মাধ্যমে উপাসক স্বর্গে যায় এবং অনন্তকাল স্বর্গ ভোগ করে। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্বর্গ মোটেই লোভনীয় কিছু নয়। বরং স্বর্গও আসলে বন্ধন। ঈশ্বরের উপাসনাকারী এই স্বর্গ, নরক-সহ সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেমেটিক মতে ঈশ্বর উপাসককে অনন্ত ভোগ দান করেন। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে উপাসককে ঈশ্বর সমস্ত ভোগ থেকে মুক্ত করেন।

সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বরকে কোনোভাবেই সেমেটিক গ্রন্থসমূহে প্রতিপাদিত ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তাই সমাজ থেকে ‘ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম’ ইত্যাদি বিভ্রান্তি দূর হওয়া প্রয়োজন। ■

বিশেষ নিবন্ধ

ভারতবর্ষে হালাল সার্টিফিকেশন এক সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা

ড. প্রদোষ রঞ্জন ঘোষ

হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির রমেশ সিন্ধের মতে হালাল অর্থব্যবস্থা ভারতবর্ষে এক সমান্তরাল সাম্রাজ্যবাদী অর্থব্যবস্থা হিসেবে চলেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনোত্তর ভারত পাশ্চাত্য ধারণার সেকুলারবাদীদের দখলেই রয়ে গিয়েছে। তথাকথিত মুসলমান সম্প্রদায়ের ভোটব্যাঙ্ক দখলের স্বার্থে আজ পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন ধর্মান্ধ আদবকায়দা সেকুলার তকমার আড়ালে প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। ফলস্বরূপ সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৫ শতাংশ) হিন্দুরা বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে। মুসলমানদের (১৫ শতাংশ) আবদার ধর্মীয়ভাবে সম্মত ও স্বীকৃত হালাল নীতি চালু করতে দিতে হবে, এভাবেই সেকুলারিজমের আড়ালে ইসলামিকরণ ও ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে (হালালোনোমিক্স) চালু করার প্রচেষ্টা হয়ে চলেছে। এইভাবে প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ সমান্তরাল অর্থব্যবস্থা হতে চলেছে এই হালালোনোমিক্স।

ভারতে 'জামাত-উলেমা-ই-হিন্দের' হালাল ট্রাস্ট কোষাগারের অন্যতম প্রধান সার্টিফিকেট দেওয়ার অধিকারী সংস্থা। এই সংস্থা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে ভারতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় ধৃতদের আইনি লড়াইয়ের জন্য (সংখ্যায় প্রায় ৭০০) অর্থ সাহায্য করে করে থাকে। অর্থাৎ ঘুরপথে হিন্দুরা হালাল সার্টিফায়েড বস্তু কিনে সন্ত্রাসবাদীদের তহবিল গড়তে সাহায্য করছে এবং ক্রমশ নিজেদের অংশীদারত্ব পঙ্গু করে ফেলছে। হিন্দুদের দাস মনোবৃত্তির কারণেই হালাল অর্থনীতি ভারতে প্রসার লাভ করছে যা আগামীদিনে ভারতবর্ষীয় জীবনের অস্তিত্বই প্রবল সংকটের সম্মুখীন হয়ে পড়বে।

হালাল সম্বন্ধে ইন্টারনেটে 'হালাল ইন্ডিয়া ডট কম উট ইন' থেকে সমস্তরকম তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। এদের এক্তিয়ারে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও পানীয় ৩৮ শতাংশ, ফার্মাসিউটিক্যাল ২৩ শতাংশ, বেকারিপণ্য ১৩ শতাংশ, প্রাথমিক মাংস ১১ শতাংশ, প্রসাধনী ও ব্যক্তিগত যত্ন ৯ শতাংশ, নিউট্রাসিউটিকল ৬ শতাংশ এদের নিবেদিত সেবা পণ্য শংসাপত্র। রেস্তরাঁ শংসাপত্র, পর্যটন,

> আমাদের দেশেও বিভিন্ন রাজ্যে ও শহরে এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পেশা মুসলমানদের ক্রমশ দখলে চলে আসছে। ন্যাশনাল পার্টি অব অস্ট্রেলিয়ার জর্জ ক্রিসটেনসেন দাবি করেন যে অস্ট্রেলিয়ার হালাল অর্থনীতির টাকা সেদেশে শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের দেওয়া হয়।

মেডিক্যাল টুরিজম, হালাল প্রশিক্ষণ, গুদাম শংসাপত্র ও হালাল গাইডেক্স। এদের প্রচার হালাল শংসাপত্র ১১৭টি দেশে বাণিজ্য অনুমতি পেতে প্রয়োজনীয় একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত শংসাপত্র। প্রতিবছর ১ নভেম্বর 'বিশ্ব হালাল দিবস' যাপন করা হয়। ভারতে এদের কর্পোরেট অফিসের ঠিকানা হলো ওখলাগ্রাম, হাসিয়ানগর, নতুনদিল্লি-১১০০২৫ এবং ট্রিপলিকেন হাইরোড, ট্রিপলিকেন, চেন্নাই-০০০০০০৫।

● হালাল অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা :

মালয়েশিয়ার 'ইসলামিক ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট ১৯৮৩' অনুসারে 'ইসলামিক ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স (আইবিএফ) ব্যাঙ্কের গঠন হয়। এই ব্যাঙ্ক শরিয়তি কানুনে চলে, সেজন্যে অমুসলমান দেশগুলিতে যেমন ভারতে বেআইনি। সেক্ষেত্রে ভারতে এদের টাকাপয়সার আদানপ্রদান হাওলার (বেআইনি) মাধ্যমে করা হয়। ২০১১ সালে মালয়েশিয়া সরকার স্থানীয় বাণিজ্য মন্ত্রালয়ের উদ্যোগে 'হালাল প্রোডাক্ট ইনডাস্ট্রি (এইচপিআই) শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে কুয়ালালামপুরে ওয়ার্ল্ড হালাল রিসার্চ এবং ওয়ার্ল্ড হালাল ফোরামের অধিবেশনে হালাল অর্থব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। হালাল প্রোডাক্ট ইন্ডাসট্রি এবং ইসলামিক ব্যাঙ্কিং অ্যান্ড ফাইন্যান্সের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে হালালোনোমিক্সকে শক্তিশালী করতে সুনিশ্চিত করা হয়। এর প্রসারের জন্য নিজেদের অর্থসাহায্যে 'সোশ্যাল অ্যাকসেপটেবল মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট (এসএএমআই)' 'হালাল ফুড ইনডেক্স' শুরু করে। বিশ্বে এই ধরনের প্রয়াস এই প্রথম। এইচএসবিসি (বহুরাষ্ট্রীয় নিবেশ অভিকোষ)-র মালয়েশিয়ার ডিরেক্টর রেফ

হানিফ হালাল অর্থব্যবস্থার প্রসারের জন্য উৎপাদন থেকে ক্রেতা পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের প্রস্তাব রাখেন। লাভের অংশ থেকে হালাল অর্থব্যবস্থাকে আরও দৃঢ় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এই প্রস্তাবনার পর ২০০০ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে ইসলামিক ব্যাঙ্কের সম্পত্তির পরিমাণ ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ হালাল অর্থব্যবস্থা এইভাবে দুনিয়ায় দ্রুত বর্ধনশীল অর্থব্যবস্থা হিসেবে গড়ে উঠেছে। অরগেনাইজড সেক্টরে হালাল অর্থব্যবস্থা ৪.৫৪ লক্ষ কোটি আমেরিকান ডলার ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ ৯.৭১ লক্ষ কোটি ডলার হয়ে উঠবে। তুলনায় আনঅর্গানাইজড সেক্টরে পরিধি আরও বৃহৎ। সুতরাং হালাল অর্থব্যবস্থার ব্যাপ্তি সহজেই অনুমান করা যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিশ্বে মাত্র ১২-১৫ শতাংশ মুসলমান ক্রেতা অর্থাৎ হালাল বস্তুর ৮৫ শতাংশ ক্রেতারা অমুসলমান।

● হালাল মাংসের গুণমান :

আহারের প্রয়োজনে পশুবধের বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন নিয়মকানুন করা হয়েছে। লক্ষ্য হলো আহারযোগ্য প্রাণীটিকে বধ করার পদ্ধতি যেন যথাসম্ভব মানবিক হয় এবং গ্রহণীয় মাংস স্বাস্থ্যবিধি সম্মত হয়।

বিশ্বজুড়ে দুটি প্রধান ধর্মীয় পশুবধ পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন হয়ে আসছে, 'কোশার' (আকা শেচিতাহ) এবং 'হালাল' (আকা ধাবিহাহ)। কৌশলের দিক থেকে দুই পদ্ধতিই মুদ্রার এপিট ওপিট যথাক্রমে ইহুদি ও মুসলমানদের দ্বারা প্রচলিত। অন্যদিকে 'ঝট্‌কা পদ্ধতি' প্রধানত হিন্দু ও শিখদের দ্বারা প্রচলিত। হালাল পদ্ধতিতে পৃষ্ঠদেশের সুষুম্নাকাণ্ডকে অক্ষত রেখে গলার অঙ্কীয়তলের নলী কাটা হয়, অন্যদিকে ঝট্‌কা পদ্ধতিতে এককোপে ঘাড় থেকে মুণ্ডচ্ছেদ করে ধড় থেকে আলাদা করা হয় সুষুম্নাকাণ্ড-সহ। ঝট্‌কায় প্রাণীটিকে তুলনামূলকভাবে অল্পই কষ্ট সহ্য করতে হয়। তবুও মাংস ব্যবসায় ব্যাপকগুরুত্ব থাকায় বিশ্বজুড়ে হালাল পদ্ধতিই বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। হালাল ইন্ডিয়া কোম্পানি দাবি করে তাদের পদ্ধতিতে বধ করা মাংস স্বাস্থ্যকর। যদিও এই মতবাদ শুধুমাত্র ইসলামি প্রচারের জন্যই। এই দুই বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা প্রাপ্ত মাংস কতটা বিজ্ঞানসম্মত, মানবিক ও নীতি সম্মত? এ প্রসঙ্গে আমেরিকায় গবেষণারত ড. দে প্রকাশিত রিভিউর অংশ বিশেষ (বঙ্গদেশ ডটকম,১২ জুন ২০১৯) এখানে উল্লেখ করা হলো—

(১) দেহে কোনো অনুভূতি প্রথম জ্ঞাত হয় দেহকোষে অবস্থিত 'কগনেট' গ্রাহক প্রোটিন দ্বারা, পরবর্তীস্তরে এই অনুভূতি নার্ভ দ্বারা প্রবাহিত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছায়। মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া হওয়ার পর পুনরায় পর্যায়ক্রমে মস্তিষ্ক থেকে সুষুম্নাকাণ্ডের মাধ্যমে দেহের কারক অংশে (পেশী ও অন্তক্ষরা গ্রন্থী) পৌঁছায়। হালাল করা হলে সুষুম্নাকাণ্ডের ক্রিয়াপথটি অক্ষুণ্ণ থাকায় অনুভূতি ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল হওয়ায় পশুটির যন্ত্রণা মৃত্যু পর্যন্ত চালু থাকে। অন্যদিকে ঝটকার ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাবাহী পথটি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রণার অনুভব বন্ধ হয়ে যায়।

(২) অবোলা গৃহপালিত জীব সবসময় তাদের যন্ত্রণা প্রকাশ করে উঠতে পারে না কিন্তু ইইজি (electro encephalogram) দ্বারা এই কষ্ট জানা যায়। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ যে, ঝটকায় ৫-১০ সেকেন্ডের মধ্যেই গুরুমস্তিষ্কের কার্যকারিতা স্তব্ধ হয়ে যায়। ফরাসি, ব্রিটিশ ও অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীদের গবেষণায় জানা যায় যে, হালাল করা হলে দেহের ক্ষতিকর উদ্দীপনার চেতন ঘটে, ফলে সংশ্লিষ্ট পশুটি অসহ্য যন্ত্রণা পেতে থাকে। গোরু, বলদ ও ছাগলের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে হালাল বা কোশার করা হলে তিনটি স্ট্রেস হরমোন যথা কর্টিসল, নরঅ্যাড্রিনালিন ও ডোপামাইন ক্ষরণ ৩০-৫০ শতাংশ বেড়ে যায়। অধিক যন্ত্রণা থেকে উৎপন্ন স্ট্রেস হরমোনগুলি অধিক্ষরণের ফলে পেশীতে সক্রিয় সমস্ত গ্লাইকোজেন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং বাজারে নিয়ে আসা পর্যন্ত আর কোনো ল্যাকটিক অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে না, ফলস্বরূপ p^H অত্যাধিক বেড়ে যাওয়ায় ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মাংস শুষ্ক, শক্ত ও কালো বর্ণের হয়ে পড়ে। অন্যদিকে স্টেরয়েড জাতের স্ট্রেস হরমোনগুলি কোষপর্দা ভেদ করে নিউক্লিয়ার ডিএনএ গ্রাহকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোষে অপরিবর্তনীয় জেনেটিক পরিবর্তন ঘটায়, যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। আমেরিকার ন্যাশানাল ইন্‌স্টিটিউট অব হেল্‌থ অন্য পরীক্ষায় দেখেছে যে, ভেড়াতে স্ট্রেস হরমোন ইনজেকশন দেওয়ার পর মাংসের গঠন ও স্বাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

● হালাল বনাম ঝট্‌কা আন্দোলন : হিন্দু ও শিখদের ঝট্‌কা সার্টিফিকেশনের প্রচলনের আন্দোলন :

শিখদের দশমগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহ মাংস খেতে চাওয়া খালসাদের শুধু ঝট্‌কা মাংস খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। শিখ মতে হালাল মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। হিন্দুদের মধ্যে যদি ঝট্‌কা মাংস খাওয়ার চাহিদা/দাবি বেড়ে ওঠে তবে হিন্দু কসাইদের রুজি রোজকার টিকে থাকবে এবং নিশ্চিত হওয়া যাবে যে হালাল অর্থনীতির তহবিল গড়তে হিন্দুরা সাহায্য করছে না আর ধর্মকে অবনমনের হাত থেকেও রক্ষা করবে।

সরদার রবিরঞ্জন সিংহ যিনি ড. ঝট্‌কা এবং কিং অব ঝট্‌কা নামে জনপ্রিয়। তিনি হিন্দু মহাসভার একজন সক্রিয় সদস্য এবং রামজন্মভূমির মামলাকারী হালালোনোমিক্সের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের অগ্রগামী নেতা। গত এক দশক ধবে তিনি ঝট্‌কা আন্দোলনের দেশজুড়ে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। তার নেতৃত্বে দেশে 'ঝট্‌কা সার্টিফিকেশন অথরিটি' গড়ে উঠেছে যারা ঝট্‌কা সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে।

● হালাল শংসাপত্র বস্তুর বিক্রি ভারতে এক বেআইনি উদ্যোগ :

হালাল দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারিকরণের বিরুদ্ধে এবং ঝট্‌কার প্রচলনের জন্য জনজাগরণ ও আন্দোলন ভারতে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ হালালিকরণের ফলে অমুসলমানদের বঞ্চিত করা হচ্ছে যার মধ্যে অধিকতর বঞ্চনার শিকার হয়ে উঠেছে দলিত, তফশিলি জাতি ও উপজাতির জনগোষ্ঠীর লোকেরা যারা এই পেশায় যুক্ত। 'অপ ইন্ডিয়া ডট কম'-এর ইংরেজি সংস্করণের সম্পাদিকা নুপুর শর্মার প্রচারিত প্রতিবেদনে হালাল বস্তুর বিক্রির প্রতি পক্ষপাতিত্বের এবং এজন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বঞ্চনার অভিযোগ করা হয়। প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান ব্যবসার পৃষ্ঠপোষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে, এমনকী সুদূর ব্রিটেন থেকেও মন্তব্য করা হয়েছে (জানা গেছে এরা লেবার পার্টির সঙ্গে যুক্ত) এবং ভবিষ্যতে এই প্রকার রচনার জন্য বিজ্ঞাপন বন্ধ করার হুমকিও দেওয়া হয়।

ঝট্‌কা আন্দোলনের প্রচারের একজন

অগ্রগণ্য এবং সক্রিয় সদস্য সুপ্রিম কোর্টের তরুণ অ্যাডভোকেট ও সমাজকর্মী ইসকরণ সিংহ ভাণ্ডারী। তথ্য দিয়ে তিনি জানাচ্ছেন যে, বিদেশে (ব্রিটেন, কানাডা ইত্যাদি) হালাল মাংস নিষিদ্ধ অথচ ভারতে বিভিন্ন সরকারি (যেমন এয়ারইন্ডিয়া) ও বেসরকারি (যথা ম্যাকডোনাল্ড) সংস্থাগুলি শুধুমাত্র হালাল মাংসই কেনা-বেচা করে থাকে যেখানে ভারতীয় সংবিধান ও আইনের চোখে সামাজিক, আর্থিক ও ধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও বেআইনি। এদেশে ক্রেতার অধিকার অস্বীকার করা হচ্ছে, জোর করে ইসলামিক স্বীকৃত জিনিসই নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই প্রকার হালাল হেজিমনি ও হালাল মনোপলির বিরুদ্ধে জনজাগরণ ও জনআন্দোলনের দাবিতে হালাল শংসাপত্রের সমান্তরাল 'ধর্মীয় সার্টিফিকেট' চালু করার জন্য তার প্রচারের সমর্থনে ইতিমধ্যে প্রায় এক লক্ষের অধিক সই সংগ্রহ করে (আন্দোলনে যোগদানের জন্য http://www.change.org/p/government of...) ভারত সরকারের খাদ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেছেন। ভারতের অমুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সচেতনতার জন্য সংবিধানের আইনি তথ্য তুলে তিনি জানাচ্ছেন যে সংবিধানের 'সমতার অধিকার' আর্টিকেল ১৪-১৮ অনুসারে ধর্ম, জাতি, কাস্ট, লিঙ্গ, সম্প্রদায়, জন্মস্থান, বাসস্থান ও নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্ব রাষ্ট্রকর্তৃক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও বেআইনি। আর্টিকেল ১৬ ও ১৯-এ আরও বলা হয়েছে যে সাম্যের অধিকারে রাষ্ট্র তফশিলি জাতি ও জনজাতিদের জন্য সংরক্ষিত অধিকার অনুসারে ব্যবসা ও অন্য কারবারের অধিকারে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও বেআইনি। 'প্রিভেনশন অব অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্ট ১৯৮৯' অনুসারে উক্ত অধিকারের লঙ্ঘন করা হলে ৫ থেকে ৭ বছর জরিমানা-সহ জেলবাস নির্ধারিত করা আছে। এইরূপ পক্ষপাতিত্বের জন্য হিন্দুদের মধ্যে ঘাটিক কাস্ট, কসাই সম্প্রদায় ও শিখদের একাংশ ক্রমশ কর্মহীন হয়ে পড়ছে অথচ বেআইনি এই ব্যাপারগুলো ঘটে চলেছে মাত্র পনেরো শতাংশের স্বার্থে, বাকি পঁচাশি শতাংশের ন্যায্য দাবি অস্বীকার করা হচ্ছে অসংবিধানিকভাবে। এই অনুসারে উন্নয়নের নামে কোনো এক সম্প্রদায়কে পক্ষপাতিত্ব করা (যেমন পশ্চিমবঙ্গে হয়ে চলেছে), ভিন রাজ্যের শ্রমিক/কর্মপ্রার্থীকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাও একইভাবে সাংবিধানিক নীতির লঙ্ঘন।

● হালাল বস্তুর বিক্রির আইনগত বৈধতা :

পক্ষপাতিত্ব অবৈধ, কিন্তু আদৌ কি হালাল শংসাপত্রধারী দ্রব্য ভারতে বিক্রি করা যায়? ঘটনাটি প্রচারের আলোকে আসে যখন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে এক হিন্দু ফল বিক্রেতার উপর স্থানীয় সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ডি.কে. দুবে আইনগত ব্যাখ্যায় জানাচ্ছেন যে, বাজারে লভ্য খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের জিনিসপত্তরের প্রচার ও বিক্রয় আইনগতভাবে ত্রুটিযুক্ত এবং কোনোরূপ বৈধতার নীতি মানা হয় না। বিশদ আলোচনার চন্য শ্রী দুবের (DK Duhey.com) মতামত দেওয়া হলো— ব্রিটিশ সরকার যখন বুঝতে পারলো যে দুনিয়াজুড়ে তাদের রাজপাঠ উঠে যাবে তখন অর্থ রোজগারের এক পন্থা হিসেবে বিক্রয়যোগ্য বস্তুর গুণমান বিচারের জন্য ১৯৪৬ সালে 'গ্লোবাল ট্রেডমার্ক' চালু করতে আইএসও-র স্থাপনা করে যা সম্পূর্ণভাবে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের স্বাধীন ভারতের নিজস্ব মূল্যমান নির্ণয়ের জন্য 'আইএসআই' আছে এবং খাদ্যসামগ্রীর জন্য এফএসএসএআই আছে তা সত্ত্বেও আইএসও-কে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। আমাদের ব্যবস্থায় প্যাকেট নং, ট্রেডমার্ক, ব্র্যান্ডিং, লোগোর ব্যবহার এবং শংসাপত্রের জন্য সরকারের নিকট রেজিস্ট্রেশন করার নিয়ম, অভিযোগ করার জন্য ভারত সরকারের রামমোহন রায় সংস্থা রয়েছে। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে দুনিয়াজুড়ে ১৬৪টি দেশের সরকার আইএসও-র এজেন্ট হয়ে তদারকি করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের আর এক ধাপ্পা আইএসবিএন বই এবং পাবলিকেশনের জন্য আইএসএস নং ম্যাগাজিনের আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডিং করে দিচ্ছে কোনো প্রকার আইনগত অথরিটি ব্যাতিরিকে। এরা বিশেষজ্ঞও নয় এবং বিষয়বস্তু নিয়েও কোনো মাথাব্যথাও নেই, শুধু পয়সার বিনিময়ে এই কাজ করে কোটি কোটি ডলার কামিয়ে নিচ্ছে। একই কর্মকাণ্ড করে চলেছে এই হালাল শংসাপত্রধারী সংস্থাও। সুপ্রিমকোর্ট দ্বারা অবৈধ ঘোষণা হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে স্লটার অ্যাক্ট ১৯৫০ থেকে সেগুলিকে ধর্মীয় কারণে বৈধতা দেওয়া হয়ে আসছে। ২০১৭ সালে সুপ্রিমকোর্ট আদেশ জারি করেছেন যে বেআইনি স্লটার হাউসগুলি বন্ধ করতে ও স্বীকৃত স্লটার হাউসগুলির উপর নজরদারি করতে এনকোর্সমেন্ট কমিটি গঠন করে যন্ত্রণা দিয়ে পশুহত্যা বন্ধ করতে।

● হালালোনোমিক্স অমুসলমানদের জাতিগত নির্মূলিকরণের এক জঘন্য কর্মসূচি :

ভারতে হালাল মাংসের জোগান সরকারি ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে হওয়ার ফলে ক্রমশ হিন্দু কসাইজগৎ কর্মহীন হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে হালাল মাংসের উৎপাদকরা (মুসলমান সম্প্রদায়) বছরে ২৩.৬৪৬ কোটি টাকার মতো মাংস রপ্তানি করে এবং দেশে ৪০,০০০ কোটি টাকার মতো মাংস ব্যবসায় দখল করে আছে। হিন্দু কসাইদের পরিণামে দ্রারিদ্রতা।

হালালোনোমিক্স কীভাবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অন্য জাতিগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তার উদাহরণ এই উপমহাদেশেই দেখতে পাওয়া যায়। ভারত থেকে ১৯৪৭ সালে পৃথক হয়ে পাকিস্তান ও অধুনা বাংলাদেশে হিন্দুদের জাতিগত অবলুপ্তি আসন্ন প্রায়। পাকিস্তান গঠনের অন্যতম উদ্যোগী তপশিলি নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভাষাতেই দেখুন তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু আইনজীবী, ডাক্তার, দোকানদার, ব্যবসায়ী ইত্যাদিদের বয়কট বাধ্য করছে বেঁচে থাকার তাগিদে ভারতে চলে আসতে।

একই ঘটনা সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তানেও হিন্দুদের টার্গেট করা হচ্ছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন রাজ্যে ও শহরে এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন বাজার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং পেশা মুসলমানদের ক্রমশ দখলে চলে আসছে।

ন্যাশনাল পার্টি অব অস্ট্রেলিয়ার জর্জ ক্রিসটেনসেন দাবি করেন যে অস্ট্রেলিয়ার হালাল অর্থনীতির টাকা সেদেশে শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের দেওয়া হয়। ■

চিঠিপত্র

কেরলের একশো শতাংশ সাক্ষরতার কৃতিত্ব বামেদের নয়

কেরলের একশো শতাংশ মানুষ সাক্ষর বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম বিষয় ছিল। এটা বলার সময় এরাজ্যের বামপন্থীরা খুব গর্ব অনুভব করতেন। প্রায় ইচ্ছে করেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন বা এখনো করে থাকেন। তারা বোঝাতে চাইতেন বা চান যে, বামপন্থাই পারে শিক্ষায় এমন সাফল্য এনে দিতে। কিন্তু নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর একটানা ক্ষমতায় থেকেও শিক্ষার হাল ফেরাতে পারেননি কেন এ প্রশ্ন তাঁদের মাথায় আসে না।

বামপন্থার গুণ প্রচারকরা 'কেরলের মডেল' নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকেন। শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় কমিউনিস্টরা কেরলের ক্ষমতা দখলের পর সেখানে সরকারি শিক্ষায় সাফল্যের থেকে ব্যর্থতা অনেক বেশি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে ২০০০ সাল আসতে আসতে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রসংখ্যা খুব কমে যায় এবং সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে যায়। ২০১০ সালের হিসেব অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। শহরে তা আরও অনেক কম। কর্মসংস্থান ক্ষেত্রেও শোচনীয় অবস্থা। ১৯১৯ সালের 'ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিক্স কমিশনের' সার্ভেতে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে বেকারত্বের হার যেখানে ৫.৩৬ শতাংশ, কেরলে বেকারত্বের হার ৯.৪৩ শতাংশ, সিকিম ও ত্রিপুরার পরে সর্বোচ্চ। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে লাগাতার হরতালের ফলে শিল্পের ব্যাপক ক্ষতি, নতুন ক্ষুদ্র শিল্প চালু করতে গেলে সরকারি অসহোযোগিতা, অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য কৃষিজমির অপ্রতুলতা, উচ্চশিক্ষিত যুবক-যুবতীদের যোগ্য কাজ দিতে না পারা ইত্যাদি।

প্রচারিত কাহিনি আর বাস্তবের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। খুব অতীতে না গেলেও চলবে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার সময় যেখানে সারা ভারতে গড় সাক্ষরতার হার ছিল ১৮ শতাংশ, সেখানে কেরলে সাক্ষরতার হার ছিল ৪৭ শতাংশ অর্থাৎ আড়াই গুণেরও বেশি।

কেরলের সমাজ বরাবরই শিক্ষাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এটা কোনো নতুন বিষয় নয়। ব্রিটিশ শাসনকালে শুধু মালাবার অঞ্চল বাদে সমস্ত কেরল করদ রাজ্য ছিল। শাসনকার্য পরিচালনা করতেন রাজা-রানিরা যারা প্রায় সবাই শিক্ষানুরাগী ছিলেন। মালাবার বাদে বাকি অংশে দুটি রাজ্য ছিল— ত্রিবাঙ্কোর ও কোচিন। রাজ্যদুটি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতো। প্রতিটি গ্রামে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক থাকতেন এবং তারা কোনো ভেদাভেদ না করে সব জাতি-বর্ণের মানুষদের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা দিতেন। বর্তমানে আমরা যাকে বিদ্যালয় বলি তিরুবনন্তপুরমে প্রথম সেরকম প্রথাগত বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালে মহারাজা সাথী তিরুনাল চালু করেন। পরে তিনি ত্রিবাঙ্কোরে অফিসিয়াল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সুচনা করেন।

ভারতে সার্বজনীন শিক্ষার ধারণা আসার অনেক আগে ত্রিবাঙ্কোরে সমস্ত বর্ণ ও জাতির নারী পুরুষের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার নীতি কার্যকর করা হয়। মালায়ালম সাহিত্যের জনক থুনচাত্থু রামানুজন তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ ছিলেন যিনি রামায়ণ, মহাভারত মালায়ালম ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

১৯৯২ সালে স্বামীজী যখন কেরলে গিয়েছিলেন তিরুবনন্তপুরম ও কোরুঙ্গালুরে নারীরা তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলেন যা কেরলের নারীরা সে সময়েও কতটা শিক্ষিত ছিলেন তা স্পষ্ট করে।

১৯৩৭-এ 'কেরালা ইউনিভার্সিটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠানো হয়। তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে জানান সময়ের অভাবে দায়িত্ব নিতে পারছেন না। এই ঘটনা কেরলের রাজাদের শিক্ষা বিষয়ে উচ্চ অনুরাগ ও দূরদর্শিতার একটি প্রমাণ।

এগুলো মাত্র কয়েকটি বিষয় যা থেকেই বোঝা যায় কেরলে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার অনেক আগে থেকেই দেশে অগ্রণী অবস্থানে ছিল। কোনো একটি রাজনৈতিক দল রাজ্যের ক্ষমতা দখল করলো ও চিত্র বদলে গেল এমনটা ভাবা এক্ষেত্রে একেবারেই অবাস্তবোচিত, যারা এ নিয়ে কৃতিত্বের দাবি করেন তারাও নিজেদের হাস্যকর করে তোলেন।

—মানস কর,
কোচবিহার।

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাই

মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় এসে 'বদলা নয় বদল চাই' স্লোগান তুলেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলার রাজনীতিও শুরু করেছেন তা বলাই বাহুল্য। রাজ্যে পালাবদলের আগে বাম দুঃশাসনে মানুষ তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সন্ত্রাস, হানাহানি, ভোটে কারচুপির ঘটনা মানুষ কখনও ভুলবে না। বদলের রাজনীতিতেও যেন পুরনো স্মৃতি মাঝে মাঝেই ফিরে আসে। সত্যিই ক্ষমতার লোভ রাজনীতিকে চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। বাম আমলের পুনরাবৃত্তি যেন ঘটেই চলেছে। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ, কাটমানির ঘটনা, সন্ত্রাস, বিরোধীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানো এ রাজ্যের রাজনীতিকে ক্রমশ কলঙ্কিত করেছে। আবার সাংবাদিকদের নিরপেক্ষতা নিয়েও অনেক সময় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দেয়। প্রশাসনেও মানুষ সবসময় সুবিচার পায় না। ভুললে চলবে না যে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় এসে বিজয় মিছিলের পরিবর্তে শান্তি মিছিল করেছিলেন, বেজেছিল রবীন্দ্রসংগীত। সারা রাজ্যে শান্তির বার্তা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে বদলের রাজনীতি যেন ক্রমশই বদলার রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। একটা সরকারের সফলতা নির্ভর করে রাজ্যের নিরবচ্ছিন্ন স্থিতিশীল পরিবেশ,

শান্তি ও সুশাসনের ওপর। বিরোধী দলকে অপদস্থ ও অস্বীকার করে সেটা অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের রাজ্যে এখন সেটাই ঘটে চলেছে। সাধারণ মানুষও যেন ক্রমশই বিমুখ হয়ে পড়েছে। বিগত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে তার কিছুটা প্রভাবও পড়েছে। বিজেপি ১৮টি লোকসভার আসন পেলেও তৃণমূল নেত্রীর কাছে তা তুচ্ছ মনে হচ্ছে। তাই তিনি ২১ জুলাই ভার্চুয়াল সভায় এ ঘটনাকে 'সামান্য কটা আসন' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিজেপিই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে স্বীকৃত হয়ে গেছে। বর্তমানে তাই রাজ্যের কোণায় কোণায় বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে। মুখে যাই বলুন না নেত্রী, আসল সত্যটা হলো তিনি খুব ভয় পেয়ে গেছেন। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া শাসকদল। ভুললে চলবে না যে বামেদের পতন হয়েছিল কিন্তু রাজনৈতিক অস্বচ্ছতা, প্রতিহিংসার কারণে। 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি' কিন্তু পতনের অন্যতম কারণ। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে পরিবর্তনের হাওয়ায় রাজ্যে পালাবদলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে বদলা নয়, বদলের রাজনীতিকে হাতিয়ার করে গঠিত হোক নতুন সরকার। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। আগামী সরকার গঠিত হোক মানুষের সরকার, মানবতার সরকার, জাতীয়তাবাদী সরকার। গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে রাজ্যে বদলার রাজনীতিতে আবারও অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। রাজ্যে সেটা নিশ্চয়ই আশাপ্রদ নয়। তাই গণতন্ত্রের জয় হোক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে কিন্তু সেটাই রক্ষাকবচ।

—**সমীর কুমার দাস,**
দ্বারহাট্টা, হুগলি।

আক্রমণের শিকার কঙ্গনা রানওয়াত

বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানওয়াতের অনুপস্থিতিতে অবৈধ নির্মাণের অভিযোগে তাঁর অফিস ভাঙচুর করল মহারাষ্ট্র সরকার। যখন তিনি মুম্বাইয়ের বাইরে চণ্ডিগড়ে ছিলেন সেই মুহূর্তে শিবসেনার বিএমসি মুম্বাই পালি হিলে মণিকর্ণিকা ফিল্ম দপ্তরে জেসিবি দিয়ে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। আগে মণিকর্ণিকা ফিল্ম দপ্তর আইনি ছিল। যেই কঙ্গনা রানওয়াত সুশান্ত সিংহ রাজপুতের হয়ে প্রতিবাদ করছেন ঠিক তখনোই মণিকার্ণিকা হলে গেল অবৈধ নির্মাণ। পাঠানো হলো নোটিশ।

কী দোষ ছিল কঙ্কনা রানাউতের? দোষ এটাই যে, তিনি বলিউডের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যে কিনা খুব অল্প সময়ে বিহারের এক অজ্ঞাত গ্রাম থেকে উঠে এসে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে নাম যশ খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছিলেন, সেই সুশান্ত সিংহ রাজপুতকে হত্যা করা হয়েছে বলে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিলেন। সুশান্ত সিংহের কোটি কোটি ভক্ত ও তাঁর পরিবার মনে করেন সুশান্ত সিংহ আত্মহত্যা করেননি। আর কখনো করতেও পারে না। তাঁকে সুপরিকল্পিতভাবে কেউ বা কারা হত্যা করেছে। তাঁর হত্যার পেছনে মহারাষ্ট্রের কোনো বড়ো গ্যাং রেকেটের হাত আছে বলে দাবি করেন।

বলিউড ইন্ডাস্ট্রির কোনো অভিনেতা অভিনেত্রী সুশান্তর মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। মুখ খুলে একটা কথাও বলেননি কেউ। সেখানে একমাত্র উচ্চস্বরে আওয়াজ তুলেছেন বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানওয়াত । তিনি সত্যের পথে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সুশান্ত সিংহের মৃত্যুরহস্য ভেদ করার জন্য নিজের জীবনের পরোয়া না করে আর এক অভিনেতাকে ন্যায় দেওয়ার জন্য প্রতিবাদ করে গেছেন। কখনো সুশান্ত সিংহের পরিবারের পাশে থেকে , কখনো ইন্টাগ্রাম, টুইটারের মতো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন— মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন নামকরা বলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রী। তাঁদেরকে মদত দিচ্ছে মহারাষ্ট্র সরকার ও প্রশাসন। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পেছনে পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রির মাফিয়াচক্র জড়িত বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, আমার মণিকর্ণিকা ভব্য রামমন্দির। এছাড়া বিএমসি অফিসারদের বাবরের সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, যতই বাবরের অনুগামীরা এসে ভেঙে দিয়ে যাক আমি তা আবার পুনরায় গড়বো।

গণতন্ত্র আজ কোথায়? প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে বারবার। কীসের ভয় আজ কংগ্রেস-এনসিপি-শিবসেনা মহাজোট সরকারের? কোন পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে? যার ফলে আজ একজন মহিলার মুখ বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে শিবসেনার মহাজোট সরকার। এভাবে কি দমিয়ে রাখা যাবে একজন প্রতিবাদী নারীর মুখ? আজ সারা ভারতবর্ষের মানুষ ঝাঁসির রানি কঙ্গনা রানওয়াতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর জয় হবেই।

—**কৌশিক দাস,**
চিচড়া, ঝাড়গ্রাম।

অন্যের লেখা নিজের নামে!

স্বস্তিকার ৭৩ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (৭ সেপ্টেম্বর ২০২০) প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে সৈকত চ্যাটার্জির লেখা 'দেশের রাষ্ট্রপতি রূপে সার্থক-নিরপেক্ষ অবস্থান তাঁকে রাজনৈতিক মহীরূহে পরিণত করেছে' প্রকাশিত হয়। এই লেখাটির সঙ্গে সায়ক ঘোষ চৌধুরীর একটি লেখার প্রভূত মিল রয়েছে। ওই লেখাটি সামাজিক গণমাধ্যম ফেসবুকে গত ৩১ আগস্ট রাতে প্রকাশিত হয়। যদিও সৈকত চ্যাটার্জি তাঁর লেখায় মূল লেখার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেননি।

স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের অবগতির জন্য লেখাটির লিঙ্কদেওয়া হলো ঃ https://facebook.com/story.php?story fbid= 765944177306987 &id=100016742355539। এ বিষয়ে আপনাকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করি এবং লেখককে ভবিষ্যতে এরকম কাজ হতে বিরত থাকার অনুরোধ করি।

—**শৌনক রায়চৌধুরী,**
জয়নগর, দ: ২৪ পরগনা।

বিশেষ রচনা

গো-সম্পদে বলীয়ান হোক পশ্চিমবঙ্গ

ব্রাজিল এদেশ থেকে গির প্রজাতির গোরু নিয়ে গিয়ে সেদেশের গো-সম্পদ উন্নয়ন করছে এমন, যে আজ সেখান থেকে উৎকৃষ্ট গির-বীর্য ফেরত আনতে হচ্ছে আমাদের!

নীলাশিস ঘোষদস্তিদার

সম্প্রতি রাজনীতির মঞ্চে আলোড়ন তুলে পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন গো-মাতা। বলীবর্দও খুব পিছে নেই, যদিও পাদপ্রদীপের আলোয় এই মুহূর্তে গোরু। একটি নিরীহ, গৃহপালিত প্রাণী, চারটি পা, একটি লেজ বিশিষ্ট...। হ্যাঁ, এভাবেই রচনা লিখে আসর মাতাচ্ছেন গোদুগ্ধে সোনার আবিষ্কারে হাতে নতুন মজার খোরাক খুঁজে পাওয়া বাঙ্গালি নেটিজেনেরা। সোশ্যাল মিডিয়া গুলজার করে গোরু, গোরুর দুধ এবং গো-প্রেমী দিলীপ ঘোষকে নিয়ে চলছে অগুন্তি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, টীকা-টিপ্পনী। দিলীপবাবুর অনুগামীরাও স্তিমিত স্বরে এবং সীমিত স্তরে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই তো, জুনাগড়ের প্রাণীবিজ্ঞানীরা দেশি গোরুর দুধে সোনা সমেত বেশ কিছু দামি ধাতুর অল্পমাত্রায় হলেও সন্ধান পেয়েছেন।

এই অধমকেও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এমন বেশ কিছু বাদানুবাদ, উত্তপ্ত বিতর্কের মধ্যে পড়তে হয়েছে। এই মুহূর্তে, ব্যাপারটা থিতিয়ে এলেও, এ নিয়ে আলোচনা জরুরি। প্রথমত, এই তুচ্ছতাচ্ছিল্যময় বিরোধিতা দেখিয়ে দেয় শুধু যে শহুরে শিক্ষিত বাঙ্গালির কৃষি বা কৃষির সঙ্গে জড়িত কোনো বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বা আগ্রহের অভাব আছে, তাই নয়, দিলীপবাবুর বিরুদ্ধে অন্ধ বিরোধিতা দেখাতে গিয়ে ভদ্রলোক বাঙ্গালির একাংশের মুখোশ সরে গিয়ে যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে কিছুমাত্রায় রেসিস্ট বা কাস্টেইস্ট আখ্যা দিলে সত্যের ব্যত্যয় হয় না। সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্য ও উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা! গো-সন্তান, অতএব, অশ্রদ্ধার পাত্র। অথচ, এক কথায় বলতে গেলে বস বভাইন নামক যে প্রাণীটিকে আমরা এক কথায় গোরু বলে চিনি, তার কী অসীম গুরুত্ব এই উপমহাদেশের জীবনচর্যায়! বঙ্গভূমি তার ব্যতিক্রম তো নয়ই, বরং বাঙ্গালির অর্থনীতি এখন বেশ কিছুটা নির্ভর করে এর উপর, উত্তরণের পথও গো-সম্পদের লেজ ধরে পার হতে পারে।

কী রকম? সাম্প্রতিক অ্যানিম্যাল-সেন্সাসে তাবৎ কৃষিবিদকে চমকে দিয়ে, জানা গেছে ভারতের বৃহত্তম গো-সম্পদে ধনী রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ। পিছনে পড়ে গেছে উত্তরপ্রদেশ। কীভাবে সম্ভব হলো এই অসম্ভব? চিন্তাশীলদের বক্তব্য, চৌদ্দটি রাজ্যে গোরু জবাই নিষিদ্ধ। সম্প্রতি শুরু হয়েছে গো-রক্ষকদের বাড়াবাড়ি টহল। পশ্চিমবঙ্গে গোরু জবাই চলে। সেইসঙ্গে আগের চেয়ে অনেক কম হলেও বাংলাদেশে গোরু পাচারের লোভনীয় ব্যবসার সোনালি হাতছানি আছে। ফলত, সারাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসে পৌঁছচ্ছে কৃষিকাজে অব্যবহৃত এঁড়ে বাছুর বা দুধ দিতে অক্ষম গাভী। গোরু পাচারকে অনেকেই এক বিরাট কুটিরশিল্প বা অসংগঠিত ব্যবসা ধরেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রচুর ন্যায্য রাজস্ব উপার্জন করতে পারত যদি আইনি পথে গো-রপ্তানি এক সংগঠিত উদ্যোগ হিসেবে গড়ে উঠত। উল্লেখনীয়, ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের পয়লা নম্বর বীফ এক্সপোর্টার, যদিও তা মূলত মোষের মাংস বা ক্যারাবীফের দরুন। যার মুখ্য বাজার পশ্চিমের সৌদি আরব সমেত মধ্যপ্রাচ্যে। যাইহোক, গোমাংসের দরুণ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে কীরকম সম্পদের জোগান আসছে, তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ থাকলেও গোদুগ্ধের অবদান বা সম্ভাবনা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই দুই বিশিষ্ট প্রাণীবিজ্ঞানী ড. সঞ্জীব প্রতিহার বা ড. অনুপম চ্যাটার্জির। প্রতিহারবাবুর ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত দুধ উৎপাদন অনেক বেশি। হাইওয়ের প্রতি কিলোমিটারে গুচ্ছ গুচ্ছ চায়ের দোকান কোন দুধ ব্যবহার করে? বা শহরের প্রতি গলির মিষ্টির দোকানটি যে ছানা, দই বা ঘি-র ব্যবহার করে তার দুধের জোগান কি প্রকৃতপক্ষে হিসাবে ধরা হয়? সঠিক হিসাব কষলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে শুধু দুধের দাক্ষিণ্যেই অবলা গো-মাতার অবদান সু-বৃহৎ।

সঠিক ভাবে বিপণন করলে এই দুধের কারণেই তো পশ্চিমবঙ্গ বিশ্বজয় করতে পারে। গোরুর দুটি জাতি আছে। একটি ইউরোপীয়- হলস্টেইন-জার্সি ইত্যাদি। অন্যটি বস ইন্ডিকাস বা জেবু ক্যাটল। আমাদের সাহিওয়াল, থরপার্কার, মুলতানি, গির, হরপ্পার সিলমোহর থেকে যার সঙ্গে আমাদের পরিচয়! শিল্পমনস্করা ভীমবেটকার গুহাচিত্রও ভেবে দেখতে পারেন। তা এই নিখাদ ভারতীয় বা দেশি গোরু এবং যাবতীয় ভারতীয় মোষের দুধকে বলা হয় এ-টু মিল্ক। যে কোনো গোরুর দুধে প্রধানত যে প্রোটিন

থাকে, তা হলো কেসিন। আবার এর মধ্যেও মুখ্য ভাগ হলো বিটা-কেসিন। ইউরোপীয় গোরুর দুধে যে বিটা-কেসিন থাকে তা হলো এ-ওয়ান ধরনের, যা হজম করা শক্ত, পাচনক্রিয়ায় কিছু গণ্ডগোলও পাকায়। বর্তমানের বেশ কিছু গবেষণা জানাচ্ছে, ল্যাকটোজেন ইনটলারেন্স নামক যে অসুবিধায় অনেকে দুধ বা দুধজাত দ্রব্য খেতে চান না, তা আসলে এই এ-ওয়ান ধরনের দুধের কুফল।

অন্যদিকে, ভারতীয় গোরু,মোষ বা ছাগলের দুধে থাকে এ-টু ধরনের বিটা-কেসিন। উল্লেখ্য, এই প্রোটিনের গঠন মিলে যায় মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে। বললে অত্যুক্তি হবে না, মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত কোটি কোটি ভারতীয় শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য গোদুগ্ধকে মাতৃদুগ্ধ আখ্যা দিয়ে গো-মাতাকে কেউ মাতা অভীধায় ভুষিত করলে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া শক্ত। সেইজন্য দিলীপবাবু প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের সেমিনার বা সভায় গিয়ে আবেগের বশে যা বলেছেন, তা নিয়ে মুচকি হাসি চলতে পারে, কিন্তু নির্মম আক্রমণ নিতান্ত অবিবেচনার লক্ষণ। হ্যাঁ, বিটা কত্যারোটিনের দরুণ দুধে যে হলুদ আভা, তাকে দিলীপবাবু সোনার সঙ্গে তুলনা করে একটু কাব্যি করতে পারতেন। ক্ষেতভরা পাকা ধান, শরতের রোদ এমন কত কিছুকে সোনা বিশেষণ দিয়ে বাঙ্গালি কবি, লেখক পার পেয়ে গেল, দিলীপবাবু গেলেন ফেঁসে। যত দোষ, ওই আর কী!

তবে হ্যাঁ, গোরুর জয়গান কিন্তু এখনই থেমে গেল ভাবলে রচনা শেষ হবে না। বাংলাদেশে পাইকারি হারে গোরুর জবাইয়ে আর কারুর লাভ হোক বা না হোক, তাদের চর্মশিল্পের পোয়াবারো, বলা বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গে ইন্টিগ্রেটেড ডেয়ারি, বুচারি, লেদার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠলে বিশাল লাভ। ভালো কথা, 'আমুল' নামক সফল কো-অপারেটিভের টার্নওভার কত হাজার কোটি টাকা বলুন দেখি? রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে জাঁক করবেন বাবুমশাই, ওঁর শ্রীনিকেতন মডেল মানবেন না? রেড সিন্ধি গোরু এসেছিল দুধের জন্য, হলকর্ষণের লাঙল টানত কঙ্করেজ বদদ।

গোবর থেকে উদ্ভূত বায়োগ্যাস হলো মূলত মিথেন। জ্বালানি হিসেবে খুব তাপদায়ী না হলেও, ইঞ্জিনে প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা চলে, গাড়িই হোক বা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ডায়নামো সব চালানো যায়। আবার বায়োগ্যাস উৎপাদনের পরে অবশিষ্ট স্লারি মাছের খাদ্য, সার হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট।

গো-চর্ম ছাড়া গোমূত্র, গোবরের প্রভৃত ব্যবহার বাড়তে পারে। বহু শতাব্দীর ব্যবহারে প্রমাণিত গোমূত্র বা গোবর কীটপতঙ্গ তাড়াতে সক্ষম। পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য ইত্যাদির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে বাড়ছে। গোমূত্র দিয়ে গৃহস্থালীর ঘর মোছার রাসায়নিক তৈরি হচ্ছে। গোরুর বিরাট অবদান যা থেকেছে এবং থাকবে তা হলো দূষণমুক্তির ব্যাপারে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বলদ ভারতের দূষণমুক্ত শক্তির জোগান দিয়েছে। এখনও উন্নত যন্ত্র বা গাড়ি ব্যবহার করে বলদের শক্তির ব্যবহার বাড়ানো, ফসিল ফুয়েলজাত শক্তির ব্যবহার কমানো যায়।

অন্যদিকে, গোবর বহু সমস্যার সমাধান করতে পারে। ভারতের সর্বত্র জমে ওঠা জৈব-আবর্জনার পাহাড় সরাতে সাহায্য করতে পারে গোরু, মোষ। উদ্বৃত্ত ফল, তরিতরকারি, সবজির খোসা ইত্যাদি অতিদ্রুত জৈব-ইন্ধন গোবরে পরিণত করতে পারে রোমন্থনকারী প্রাণী, যথা গোরু। গোবর থেকে উদ্ভূত বায়োগ্যাস হলো মূলত মিথেন। জ্বালানি হিসেবে খুব তাপদায়ী না হলেও, ইঞ্জিনে প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা চলে, গাড়িই হোক বা বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ডায়নামো সব চালানো যায়। আবার বায়োগ্যাস উৎপাদনের পরে অবশিষ্ট স্লারি মাছের খাদ্য, সার হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট। যে জৈব আবর্জনা গোরুর অভক্ষ্য, তাকে দ্রুত সারে পরিণত করতে পারে কেঁচো। তবে, টোপ হিসেবে গোবর ছড়িয়ে দিতে হবে। এই পথে আবর্জনার পাহাড় থেকে, এমনকী উত্তর ভারতের সমস্যা ধানের খড় জ্বালানোর হাত থেকে পরোক্ষভাবে উদ্ধার করতে পারে গোরু, গোবরের মাধ্যমে। সাধে কী আর ব্রাজিল এদেশ থেকে গির প্রজাতির গোরু নিয়ে গিয়ে সেদেশের গো-সম্পদ উন্নয়ন করছে এমন, যে আজ সেখান থেকে উৎকৃষ্ট গির-বীর্য ফেরত আনতে হচ্ছে! ■

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্‌অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন। —*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

ধর্ম কী?

কাম পুরুষার্থ মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গেই জুড়ে রয়েছে। কাম পুরুষার্থকে সিদ্ধতা প্রদানের জন্য অর্থ পুরুষার্থের পথ প্রস্তুত হয়। কিন্তু কাম পুরুষার্থ মনোজগতের লীলা হওয়ার কারণে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার হয়ে পড়ে। এই নিয়ন্ত্রণের জন্যই রচিত হয় ধর্মপুরুষার্থ।

ধর্ম হচ্ছে বিশ্বনিয়ম। সৃষ্টির উৎপত্তির সঙ্গেই সৃষ্টিকে ধারণ করবার বিশ্বনিয়মও উৎপন্ন হয়েছে। এই বিশ্বনিয়মের ব্যবস্থা অনুসারে মানুষও নিজের ব্যবস্থার জন্য যে নিয়মাবলী তৈরি করেছে সেটাই হচ্ছে ধর্ম। এই ব্যবস্থা সমাজকে টিকিয়ে রাখে। নষ্ট হতে দেয় না। একেই বলে ধারণ করা। ধর্ম সমাজকে ধারণ করে। ধারণ করবার জন্যই একে ধর্ম বলা হয়।

কর্তব্য রূপেও ধর্ম মানুষের জীবনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে। যে কোনো ব্যক্তিকে তাঁর শরীর স্বাস্থ্য বজায় রাখা দরকার। পশুদের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে তেমন চিন্তা হয় না, যেমনটা মানুষের হয়ে থাকে। পশু প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে। এইজন্য তাদের আহার বিহার নিয়মিত হয়ে থাকে এবং তারা সাধারণত অসুস্থ হয় না। যদিও বা অসুস্থ হয় তবে তার প্রাণিক বৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হয়ে উচিত আহার নিয়ন্ত্রণ করে পুনরায় সুস্থ হয়ে ওঠে। মানুষ মনের আসক্তির কারণে আহার বিহারের দিক থেকে অনিয়মিত হয়ে যায় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে। ধর্ম তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায় যার দ্বারা সে নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখে। ধর্মবুদ্ধিই তাকে শেখায় যে, শরীর ধর্মপালনের নিমিত্ত তৈরি হয়েছে এবং তাকে সুস্থ রাখা দরকার। শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং বুদ্ধিকে তেজোদ্দীপ্ত রাখতে তার মনকে বশে রাখা দরকার। মন যা কিনা সর্বদাই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে, চঞ্চল থাকে, তাকে শান্ত ও একাগ্র রাখা দরকার। অর্থাৎ মানুষের নিজের প্রতি যে কর্তব্য আছে তার পালন করাই হচ্ছে ধর্মপালন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পারিপার্শ্বিকতার প্রতি মানুষের যে কর্তব্য আছে তাও তাকে পালন করতে হবে। তাকে তার আত্মীয়জনের মধ্যে পিতা, পুত্র, ভাই, স্বামী, মামা, কাকা অথবা মাতা, কন্যা, স্ত্রী, বোন, বউদি ইত্যাদি অনেকের ভূমিকা পালন করতে হয়। সেটাও তার কর্তব্য বা ধর্ম। পশু, পাখি, প্রাণী, বৃক্ষ, বনস্পতি ইত্যাদির ওপর তার যে কর্তব্য আছে সেটাও হচ্ছে তার ধর্ম। সমাজে সে শিক্ষক, ব্যবসায়ী, মন্ত্রী, কৃষক, ধর্মাচার্য ইত্যাদি অনেক প্রকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এই ভূমিকা যথোচিত সম্পাদন করা হচ্ছে তার ধর্ম। অর্থাৎ কর্তব্যকর্ম ধর্মের একটা বড়ো এবং ক্ষেত্রবিশেষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

ভারতের মনীষীগণ এই কর্তব্যকর্মকে অনেক প্রকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। এগুলো হলো—

আশ্রমধর্ম :

মানুষ পরমাত্মার সৃষ্টি। সে অনেক প্রকারের শক্তি পেয়েছে। এই শক্তির দ্বারা সে যা ইচ্ছে করতে পারে। কিন্তু করতে পারে বলেই সে যা ইচ্ছে করবে এটা অভিপ্রেত নয়। তাকে নিজের ধর্মের অনুকূল বানিয়ে সুশৃঙ্খল করতে হবে। এই দৃষ্টিতে তার জন্য চার আশ্রমের নিদান দেওয়া হয়েছে। এই আশ্রম চতুষ্টয় হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চার আশ্রমের বিবরণ এরকম :

আশ্রমচতুষ্টয় :

আশ্রম শব্দের মূলে আছে শ্রম। যেখানে থেকে মানুষকে শ্রম করতে হয়, তাকে আশ্রম বলে। আশ্রম কথাটা স্থানবাচক আবার অবস্থাবাচকও বটে। প্রাচীনকালে ঋষিমুনিরা আশ্রমে থাকতেন। বর্তমান সময়েও সদাচারী লোকেরা নিজের সংস্থাকে আশ্রমের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন, মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আশ্রম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন আশ্রম, রবীন্দ্র শর্মার কলাশ্রম প্রভৃতি। শ্রম করার অর্থ হলো কষ্ট করা, পরিশ্রম করা। বেদজ্ঞানী বিদ্বান পুরুষ ড. দয়ানন্দ ভার্গবের পরিভাষায় যেখানে নিজের ভৌতিক সুখলাভের আশায় কষ্ট করা সেটা হচ্ছে শ্রম। যখন অন্যের অজ্ঞানুযায়ী কষ্ট করা হয় তখন সেটা হচ্ছে পরিশ্রম। আর যখন অন্যের জন্য স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে কষ্ট করা হয় সেটা হচ্ছে আশ্রম। এই কষ্টকে তপস্যা বলা হয়। মানুষের জীবনকে সফল করতে এই তপস্যাই করতে হয়। জীবনকে সফল করে তোলাই হচ্ছে মানুষের লক্ষ্য। এই দৃষ্টিতেই ঋষিগণ মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার জন্য আশ্রমের ব্যবস্থা করেছেন।

মানুষকে যদি বিকাশ করতে হয় তবে তার জন্য নিয়ম ও সংযমের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বিকাশ সম্ভব নয়। বিকাশ কাকে বলে? আজকাল ভোগ্যপণ্য অধিক থেকে অধিকতর থাকাকে বিকাশ বলা হয়। খুব বিদ্বান হওয়া, খুব ধনবান হওয়া, সমাজে অনেক ক্ষমতাশালী হওয়া বা প্রতিষ্ঠিত হওয়া— এগুলি বিকাশ নয়। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশ। সুসংস্কৃত হওয়া এই সমাজের বিকাশ। ব্যক্তির সুস্থতা, বল, ইন্দ্রিয়ের কৌশল, প্রাণের ভারসাম্য, শান্ত মন, একাগ্রতা, সংযম, অনাসক্তি, বিবেকবুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, হৃদয়ের বিশালতা, সবার প্রতি প্রেম ইত্যাদি সবই হচ্ছে তার বিকাশের মাপকাঠি। শুধু ধন অথবা ক্ষমতা নয়, সমৃদ্ধি, অহিংস, জ্ঞানী, পরাক্রমী, স্বাধীন সমাজই হলো বিকশিত সমাজ। যে সমাজে ঔদ্ধত্য আছে এবং ঔদ্ধত্যকে উৎসাহিত করা হয় সেই সমাজ শোষণ, ছল, হিংসা ও অনাচারে পূর্ণ হয়ে যায়। ওই সমাজকে বিকৃত বলা যায়, সুসংস্কৃত নয়।

সমাজকে সুসংস্কৃত কেবলমাত্র ব্যক্তিই করতে পারে। সমাজকে সুসংস্কৃত করতে ব্যক্তিকে নিজের জীবনে নিয়ম ও সংযম পালন করতে হয়। ব্যক্তির জীবনকে নিয়মিত ও সংযমী করার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষ ঋষিগণ আশ্রম ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

মানুষের জীবনকে ৪টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। মানুষের জীবনকে গড়ে ১০০ বছর ধরে নিয়ে এমন কল্পনা করা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে সেটা কম-বেশি হতে পারে। এই সম্পূর্ণ আয়ুর ৪টি স্তরের ৪টি নাম দেওয়া

হয়েছে। এই আশ্রমগুলো হচ্ছে : ব্রহ্মচর্যাশ্রম, গার্হস্থাশ্রম, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রম।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম :

আয়ুর প্রথম পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম ছয় থেকে আট বছর বাড়িতেই অতিবাহিত হয়। জন্মের পূর্বে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন— এরকম তিনটি সংস্কার এ সময়ে করা হয়। জন্মের পর জাতকর্ম, কর্ণবেধ, নামকরণ, চৌলকর্ম ও বিদ্যারম্ভ এই সংস্কারগুলি করা হয়। এই সংস্কারগুলি শরীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। এসবই হলো চরিত্র নির্মাণের ভিত্তি। জীবন বিকাশের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া কীভাবে চলবে তা এই সময়েই নির্দিষ্ট হয়। যদিও ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে এর বর্ণনা নেই তার কারণ এটা ব্যক্তিকে নয় বরং পিতা-মাতাকে করতে হয়, তবে করতে হয় ব্যক্তিকেই। প্রথম পাঁচ বছরেই এই সংস্কার হয়ে যায়। তারপর উপনয়ন এবং এর সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম। ব্রহ্মচর্যের অর্থ হচ্ছে ব্রহ্মতে চর্যা। চর্যা হচ্ছে আচরণ পদ্ধতি। ব্রহ্মকে উপলব্ধির জন্য যা করা দরকার সেটাই ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মুখ্য লক্ষণগুলো হচ্ছে এরকম :

গুরুগৃহবাস : ব্রহ্মচারী মা-বাবার ঘর ছেড়ে গুরুর গৃহের জন্য যাত্রা করে। গুরুগৃহে গিয়ে সে সেখানকার সমস্ত আচার আচরণকে রপ্ত করে। এটা হচ্ছে তার গুরুকুল। গুরুগৃহের সদস্যরূপে সেখানকার সমস্ত কাজের দায়িত্বে সহভাগী হতে হয়। বাড়ির সব কাজ করতে হয়। গুরুমাকেও কাজে সাহায্য করতে হয়। পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা, জলভরা, জ্বালানি নিয়ে আসা ইত্যাদি কাজ করতে হয়। গুরুর পরিচর্যা করতে হয়। এসব কাজ হচ্ছে শ্রমসাধ্য। শ্রম করা হচ্ছে এই আশ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শ্রম করতে করতে তথা কাজ করতে করতে এসব কাজের মানসিক ও শারীরিক শিক্ষাও হয়ে থাকে। অর্থাৎ কাজ করাও শেখা হয় এবং কাজ করার মানসিকতাও তৈরি হয়ে যায়। গুরুগৃহে গুরু যা খান তেমনটাই তাকেও খেতে হয়।

ভিক্ষা : গুরুগৃহবাসকালে ভিক্ষা চেয়ে আনাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভিক্ষারও আবার নিয়ম রয়েছে। প্রতিদিন একই বাড়িতে ভিক্ষা করা যায় না. যেখানে ভালো খাবার পাওয়া যায় সেখানে প্রত্যেকদিন ভিক্ষা চাওয়া যায় না। ভিক্ষা করে তা গুরুকে অর্পণ করতে হয় এবং পরে গুরু যা দেন তা গ্রহণ করতে হয়। পাঁচটি বাড়িতেই ভিক্ষা চাইতে হয়। ভিক্ষা করলে জনসম্পর্ক হয়, বিনয়শীলতা আসে এবং

ব্যবহারজ্ঞানও বেড়ে যায়।

সংযম : সংযম অথবা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হচ্ছে ব্রহ্মচর্য আচরণের কঠোরতম নিয়ম। ব্রহ্মচর্যের সূচক মেখলা ও দণ্ড ধারণ করতে হয়। শ্বেতবস্ত্র হওয়া দরকার। রেশমি বস্ত্র, অলঙ্কার, সৌন্দর্য প্রসাধন ইত্যাদিত সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। মিষ্টান্ন সেবন করা যাবে না। নাটক, গান এবং অন্য মনোরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে ত্যাজ্য। খাটে নয় বরং মাটিতে শুতে হয়। যজ্ঞের জন্য সমিধা সংগ্রহ করতে হয়। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলা যাবে না। শৃঙ্গারপ্রধান সাহিত্য পড়া যাবে না। ধ্যান, প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদি করে একাগ্রতা এবং শরীর গঠন করতে হবে।

গুরুসেবা : গুরুর পরিচর্যা করতে হয়। গুরু আজ্ঞা পালন করতে হয়। সকালে গুরুর জাগরণের পূর্বে জাগরণ করতে হয় এবং রাত্রিতে গুরু নিদ্রা যাবার পর ঘুমোতে হয়। গুরুর যোগাভ্যাস, পূজা, অধ্যয়ন ইত্যাদির প্রস্তুতি করতে হয়। গুরুর প্রতি একান্ত যত্ন আশা করা হয়। গুরু দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁর আসন না নেওয়া পর্যন্ত বসা যায় না। গুরু অপেক্ষা উঁচু আসনে উপবেশন করা যায় না। গুরুবাক্যে সন্দেহ নয়। গুরুবাক্য প্রমাণ মানতে হয়।

বেদাধ্যয়ন : ব্রহ্মচর্য হচ্ছে অধ্যয়ন করবার জন্য। গুরু যখনই চাইবেন, অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। গুরু নির্ধারিত সময়েই অধ্যয়ন করা দরকার। গুরু নির্দিষ্ট বিষয়ই পাঠ করতে হয়।

অনুশাসন ও নিয়ম পালন : কঠোর অনুশাসন ও আশ্রমের নিয়ম পালন অনিবার্য হয়। যদি কোনো ত্রুটি হয় তবে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। গুরু যা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড নির্দিষ্ট করেন তা ভালো মনে স্বীকার করতে হয়। গুরুর বিরুদ্ধাচরণ অত্যন্ত নিন্দনীয় মানা হয়।

এভাবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম কঠোর ব্রত তপস্যা ও বিদ্যাধ্যয়নের সময়। এটা চরিত্র ও ক্ষমতা অর্জনের সময়। এটা চরিত্র ও ক্ষমতা অর্জনের সময়। সাধারণভাবে দ্বাদশ বর্ষকাল বিদ্যাধ্যয়নকাল বলে মনে করা হয়। এই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে সে গুরু প্রদত্ত নির্দিষ্ট অধ্যয়ন সেরে নেয়। অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে গুরু নিজ পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তাতে উত্তীর্ণ হলে তিনি বাড়ি যাবার অনুমতি দিয়ে থাকেন। যদি উত্তীর্ণ না হয় তবে গুরুর আজ্ঞানুসারে আগামীতেও অধ্যয়ন করতে হয়। অধ্যয়ন সমাপ্ত হলে সমাবর্তন সংস্কার হয়ে থাকে। ব্রহ্মচারী স্নান করে নতুন অলংকারাদি ধারণ করে এবং গুরু আজ্ঞায় গুরুকুল ছেড়ে নিজ পিতৃগৃহে গিয়ে গার্হস্থাশ্রমে প্রবেশ করে থাকে। সেই সময় সে বিশেষ স্নান করে থাকে বলে তাকে স্নাতক বলা হয়। সে ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাস্নাতক হয়ে থাকে। সে তখন শুধু ব্রতস্নাতক বা বিদ্যাস্নাতক নয়। এরূপ স্নাতকের সমাজে অতিশয় মান ও গৌরবপ্রাপ্ত হয়। যদি রাস্তায় রাজা ও স্নাতক মুখোমুখি হয়ে পড়ে তবে রাজাই স্নাতককে পথ ছেড়ে দেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্যক্তির সমস্ত প্রকার ক্ষমতার বিকাশ ঘটাবার জন্য হয়ে থাকে। তার শরীর বলবান, সুস্থ ও নমনীয় হওয়া দরকার। তার শরীর কষ্ট সহ্য করার জন্য সক্ষম হওয়া দরকার। তার কর্মেন্দ্রিয় কাজ করার মতো কুশল হওয়া প্রয়োজন। তার শরীর সব প্রকারের শারীরিক শ্রম ও কুশলতার কাজ করার জন্য উপযুক্ত হওয়া দরকার। তার মন সদাচারী, সংযমী তথা একাগ্র হওয়া দরকার। তার মনকে উত্তেজনামুক্ত, শান্ত রাখার অভ্যেস করা দরকার। বিনয়শীলতা, আজ্ঞাকারিতা, নিয়ম পালন, অনুশাসন ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হওয়াও তার দরকার। সেবা, শ্রদ্ধা, সমর্পণ ইত্যাদি গুণাবলী আয়ত্ত করা দরকার। গুরুসেবা, গুরুপত্নীকে সাহায্য, বৃদ্ধ পরিচর্যা, শিষ্টাচার, দৈনন্দিন কাজে কুশলতা প্রাপ্ত করতে হয়। ভবিষ্যতে তার ওপরে গৃহস্থাশ্রমের পুরো দায়িত্ব আসতে চলেছে এটা মাথায় রেখে ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই পূর্ণ পটুতা প্রাপ্ত হওয়া দরকার। এই দৃষ্টিতে আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, স্বাধ্যায়, সৎসঙ্গ, জপ, যোগাভ্যাস, গার্হস্থ কাজ, স্তোত্রপাঠ, যজ্ঞ, পূজা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির প্রয়োজনীয় শিক্ষা দরকার। রসবোধ ত্যাগ করা চাই। এজন্যই কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করা দরকার। এমনটা করলে তার মধ্যে তেজ, বল, কুশলতা, মেধা, প্রজ্ঞা, প্রতিভার গুণ প্রকাশ পায়। সে জ্ঞান সম্পাদন ও কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিতে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ জীবনের আধারশিলা।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্যপ্রকাশ গুপ্ত (প্রাক্তন অধ্যাপক)

মতামত

ইন্ডিয়ান-আমেরিকানরা ব্যাটেলগ্রাউন্ড স্টেটের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন

শিতাংশু গুহ

ডেমক্র্যাটরা ভাবছেন তাঁরা যদি আরিজোনা স্টেটে জয়ী হতে পারেন, তবে হয়তো হোয়াইট হাউস ও সিনেট দুটোই দখল করতে পারবেন। জো বাইডেনের ক্যাম্পেইন ম্যানেজার বলেই ফেলেছেন, আমরা যদি আরিজোনায় জয় পাই, তবে প্রেসিডেন্সি জিতবো। বাইডেন আরিজোনা যাচ্ছেন, কিন্তু যাবার আগে বিজ্ঞাপনে আরিজোনা ভাসিয়ে ফেলছেন। আরিজোনার প্রেসিডেনশিয়াল নির্বাচনী ইতিহাসটা একটু দেখা যাক! এই স্টেট ঐতিহ্যগতভাবে লাল বা রিপাবলিকান। ১৯৫২ সাল থেকে এই অবস্থা। ১৯৭২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ১২টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে শুধুমাত্র একবার ১৯৯৬ সালে ডেমক্র্যাট বিল ক্লিন্টন জিতেছিলেন। ২০১২-তে রিপাবলিকান মিট রমনি ৯ পয়েন্টে এই স্টেটে জনপ্রিয় বারাক ওবামাকে হারিয়েছেন। ২০১৬-তে ট্রাম্প এ রাজ্যে হিলারি ক্লিনটন থেকে ৩.৫ শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে জয়ী হন (৪৮.৭ শতাংশ ও ৪৫.১ শতাংশ)।

ফ্লোরিডাতে ট্রাম্প-বাইডেন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। নিউইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র মাইক ব্লুমবার্গ ট্রাম্পকে হারাতে সেখানে ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এর আগে ২০১৬-র প্রাইমারিতে পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পকে হারাতে তিনি ৫০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিলেন। সব গচ্চা গেছে, ট্রাম্প জিতেছেন। ফ্লোরিডার অবস্থাটা দেখা যাক। বলা হয়, ফ্লোরিডায় যিনি জয় পান, তিনি হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ১৯৬৪ সাল থেকে এই স্টেট বিজয়ী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছে। ১৯৭২ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ১২টি নির্বাচনে ৮বার বিপাবলিকান, ৪ বার ডেমক্র্যাটরা জয়ী হয়েছেন। এই টেস্টে প্রার্থী খুব কম ভোটে জয়ী হন। বারাক ওবামা প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান মিট রমনিকে হারিয়েছেন মাত্র ০.৯ শতাংশ ভোট (৫০.০ শতাংশ-৪৯.১ শতাংশ)। ২০১৬-তে ট্রাম্প প্রতিদ্বন্দ্বী হিলারিকে হারিয়েছেন ১.২ শতাংশ ভোটে। জর্জ বুশ জুনিয়র প্রথমবার এ স্টেটে জেতেন, তবে ফলাফল কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়।

সচরাচর ১০/১২টি স্টেটকে 'সুইং স্টেট' বা ব্যাটেলগ্রাউন্ড স্টেট বলা হয়ে থাকে। ডেমক্র্যাট এক নেতার মতে আমেরিকান-ইন্ডিয়ান ভোট এবার এসব স্টেটে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর হতে পারেন, বিশেষত মিশিগান, পেনসিলভানিয়া ও উইসকনসিনে। ডেমক্র্যাট ন্যাশনাল কমিটি চেয়ার থমাস পেরেস ক'দিন আগে বলেছেন, শুধুমাত্র মিশিগানে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ইন্ডিয়ান ভোট আছে। তিনি বলেন, ২০১৬-তে আমরা ট্রাম্পের কাছে ১০৭০০ ভোটে হেরেছি। পেসিলভানিয়াতে ইন্ডিয়ান-আমেরিকান ভোট ১ লক্ষ ৫৬ হাজার। ২০১৬-তে ট্রাম্প প্রায় ৪৩ হাজার ভোটে জিতেছেন। উইসকনসিনে ভারতীয় ভোট ৩৭ হাজার, ট্রাম্প জিতেছিলেন ২১ হাজার ভোটে। থমাস পেরেসের মতে এবারও এসব স্টেটে ইন্ডিয়ান-আমেরিকান এবং এশিয়ান আমেরিকান ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জো বাইডেন হয়তো এসব কারণে কমলা হ্যারিসকে তাঁর রানিং-মেট করেছেন।

৩ নভেম্বর ২০২০-র নির্বাচনও নির্ধারিত হবে এসব সুইং স্টেটের ভোটে। উভয় প্রার্থী তাই এসব স্টেটে চষে বেড়াচ্ছেন। উইসকনসিনে অনেক ভোটার বলছেন, তাঁরা বাইডেনকে চেনেন না। বাইডেন ক্যাম্পেইন মরিয়া ফ্লোরিডা জিততে, তারা জানেন ফ্লোরিডা হাতছাড়া করা যাবে না। মিনেসোটা হয়তো ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকছে! ২০১৬-তে ট্রাম্প অন্তত ১০টি স্টেটে জিতেছেন যেখানে ভোটের ব্যবধান ছিল মাত্র ২ শতাংশ। এইসব স্টেটে ১২৫টি ইলেক্ট্রোরাল ভোট আছে। জয়ের জন্যে দরকার ২৭০টি ভোট। ট্রাম্প আগেরবার জেতা ৬টি টেস্ট যেমন আরিজোনা, ফ্লোরিডা, মিশিগান, পেনসিলভানিয়া, উইসকনসিন ও নর্থ ক্যারোলিনা পুনরায় জয়ের জন্যে সর্বস্ব পণ করে মাঠে নেমেছেন। এসব স্টেটে ১০১টি ভোট আছে। একইভাবে বাইডেন ২০১৬-তে হিলারি ক্লিনটন জেতা ৪টি স্টেট, মেইন, নিনেসোটা, নিউ হ্যাম্পশায়ার ও নেভাদা ধরে রাখতে সচেষ্ট, যেখানে ২৪টি ইলেকটোরাল ভোট আছে।

ওহাইও না জিতে রিপাবলিকানরা কখনো প্রেসিডেন্ট হননি। টেক্সাস নীল স্টেট নয়, হবার সম্ভাবনাও আপাতত নেই। বাইডেন টেক্সাস জিতলে তা হবে ট্রাম্পের জন্যে ব্লো-আউট। নর্থ ক্যারোলিনার ১৫টি ভোট ট্রাম্পকে জিততেই হবে। উভয় প্রার্থী ও রাজ্যে ব্যাপক খরচ করছেন। নেভাদা লাল থেকে নীল হয়েছে, বারাক ওবামা- বাইডেন জুটি এ কাজটি করেছেন। এবারো কি নীল থাকবে? পেনসিলভানিয়ায় জিতে ট্রাম্প ২০১৬-তে হোয়াইট হাউসে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৯৮৮-তে জর্জ এইচ ডব্লুউ বুশ জয়ী হবার পর ট্রাম্প প্রথম রিপাবলিকান তিনি পেনসিলভানিয়া জেতেন। উইসকনসিনে হিলারি হেরেছেন এবং ১৯৮৪-এর পর ট্রাম্প একমাত্র রিপাবলিকান তিনি সেখানে জয় পেয়েছেন। মিশিগান ডেমক্র্যাট ফেভারিটি, ২০১৬-তে ট্রাম্প জয় ছিনিয়ে নিয়েছেন। মিনেসোটা ২০১৬-তে ১.৫ শতাংশ ভোটে হিলারিকে সমর্থন দিয়েছিল। ব্যবধান সামান্য, ভোট ১০টি। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ৪টি ইলেকটোরাল ভোট আছে, ডেমক্রেটরা গত চারটি নির্বাচনে জিতেছেন, এবার কি ট্রাম্প জিতবেন?

অঙ্গনা

বৈজ্ঞানিক বিভা চৌধুরী ও মহারানি চক্রবর্তী

সুতপা বসাক ভড়

রসায়ন বিদ্যায় যেমন অসীমা চট্টোপাধ্যায়, পদার্থবিদ্যায় তেমন ছিলেন বিভা চৌধুরী। পার্টিকল ফিজিক্স ও কসমিক রশ্মিতে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। ১৯১৩ সালে তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা উর্মিলা দেবী এবং বাবা বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ বঙ্গবিহারী চৌধুরী। তাঁর মাসী নির্মলা দেবী ছিলেন বিখ্যাত ডাক্তার নীলরতন সরকারের স্ত্রী। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বিএসসি অনার্স করে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় এমএসসি করেন ১৯৩৬ সালে। তিনি একমাত্র মহিলা, যিনি ওই বছর পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে বোস ইন্সটিটিউটে যোগদান করেন এবং পদার্থবিদ দেবেন্দ্রমোহন বোসের সঙ্গে কাজ করেন। দেবেন্দ্রমোহন বোস ছিলেন ওই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর। ১৯৪১ সালে তাঁদের গবেষণাপত্র বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা নেচার-এ প্রকাশিত হয়। এরপর বিভা চৌধুরী প্যাট্রিক ব্ল্যাকেটের গবেষণাগারে যোগ দেন। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে কসমিক রশ্মির ওপর তিনি কাজ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি তাঁর পিএইচডি-র থিসিস—'Entensive air showers associated with penetrating pasticles' জমা করেন। তৎকালীন বৈজ্ঞানিকরা এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত ইতিহাসবিদরা দেখেন ব্ল্যাকেটের নোবেল প্রাপ্তির পেছনে তাঁর অবদান কতখানি ছিল।

ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি টাটা ইন্সটিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চে কর্মরত থাকেন। মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাগত গবেষক হিসেবেও কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি কোলার গোল্ড ফিল্ডে-এর গবেষণার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। এরপর তিনি কলকাতায় এসে সাহা ইন্সটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ যোগদান করেন।

বিজ্ঞানে বাঙ্গালি মহিলাদের অবদানের কথা বলতে গেলে মহারানি চক্রবর্তীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের প্রথমদিকের Molecular Biologists-দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতমা। ১৯৩৭ সালে তাঁর জন্ম হয়। বোস ইনস্টিটিউট থেকে তিনি পিএইচডি করেন। ১৯৮১ সালে Recombiant DNA Technology - এর ওপর এশিয়া এবং প্রাচ্যে তিনিই প্রথম Laboratory Course-এর ব্যবস্থা করেছিলেন।

বিভা চৌধুরী

মহারানি চক্রবর্তী

তাঁর ডক্টরাল থিসিসের অংশ হিসেবে তিনি Cell free Protciu Synthesis দেখান। বিএল হরিকার-এর গবেষণাগারে নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিন-এ তিনি এনজাইম কেমিস্ট্রিতে পোস্ট-ডক্টরাল ট্রেনিং নেন। তাঁর বিশেষ ট্রেনিং ছিল 'bacterial genetics and virology'-তে যা Cold Spring Harbor Laboratory, Long Island, U.S.-তে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগে যোগ দেন।

তাঁরা দুজনেই যখন বিজ্ঞানে তাঁদের আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করেন, তখন সমাজব্যবস্থা বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষণশীল ছিল। পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা, উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখা এবং তা সার্থকভাবে পূর্ণ করার মধ্যে যে সংগ্রামের কাহিনি আছে, তার প্রায় সবটাই আমাদের কাছে অজানা। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়েও মেয়েদের এগিয়ে যাবার জন্য পরিবার সমাজের থেকে অনেকরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়। সেই যুগে এই বাধা আরও বেশি ছিল। সেইসব বাধা অতিক্রম করে বিভা চৌদুরী, মহারানি চক্রবর্তী এবং অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের মতো বৈজ্ঞানিকরা পরিবার, সমাজ, দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের মঙ্গলার্থে নিজেদের সাধনাকে উৎসর্গ করেছিলেন। এঁরা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৪ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় অভিমন্যু গুহ-র লেখায় '২১ ফেব্রুয়ারি নয়, ২১ সেপ্টেম্বরই হোক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ছাপা হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ২০ সেপ্টেম্বর হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

— সঃ স্বঃ

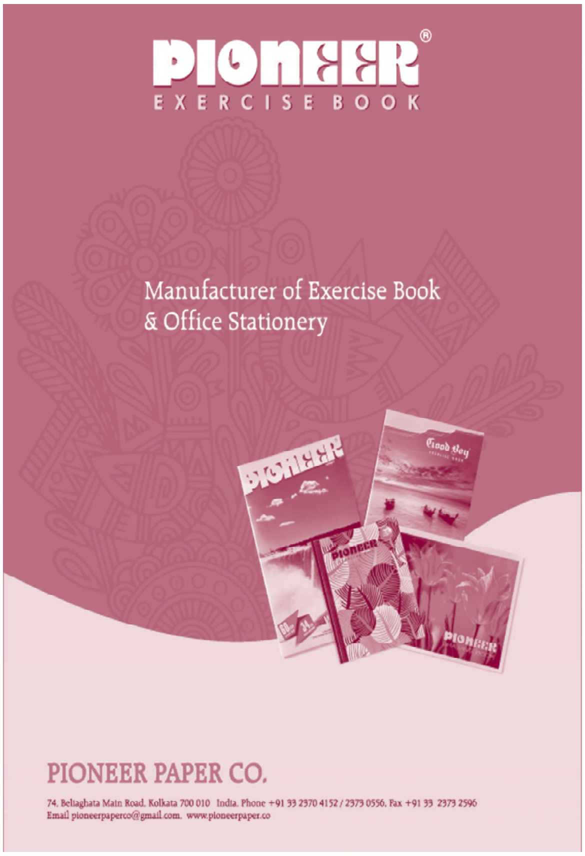

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

With Best Compliments from-

A Well Wisher

SURYA
Energising Lifestyles
Innovative
DESIGN
World-Class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA
lighting
fans
appliances
pipes
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni